Missing Issues
Sundaram

Yr. 5, No. 1, 1368 B.S.
to
Yr 5, No. 2, 1368 B.S.

(1961)

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 5, No.3 - 12, 1368 B.S (1961) – Year 6, No. 2, 1368 B.S. (1961).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: Good.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

নন্দন

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

এ সংখ্যার লেখা ও লেখক :

নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ	সুধীর কুমার নন্দী
বাংলার নব্যরীতির চিত্রকলা	অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কান্নার গন্ধ	অমরেন্দ্র ঘোষ
শিল্পী পল ন্যাস	অংশুরঞ্জন সেন
শিল্প দীপঙ্কর	সন্দর্শন শর্মা
প্রদর্শনী পরিক্রমা	শঙ্কর দাশগুপ্ত
খবরাখবর	ফণীভূষণ আচার্য । নিজস্ব সংবাদদাতা

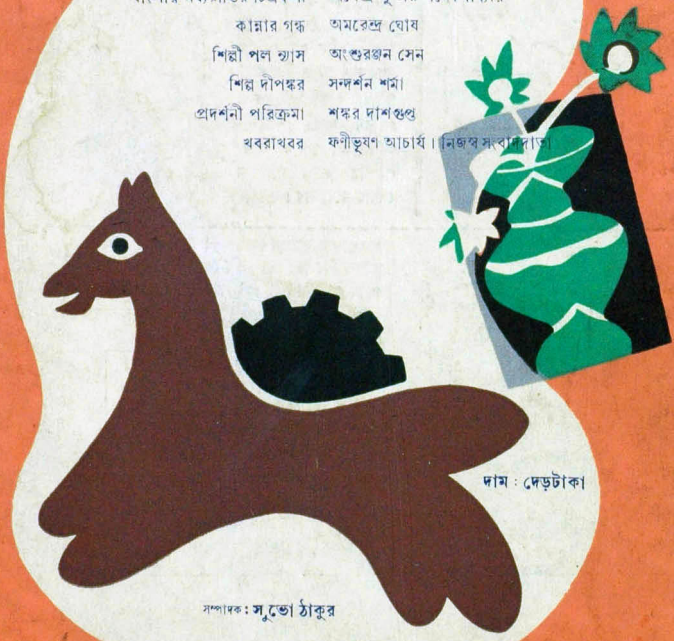

দাম : দেড়টাকা

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ। "দীপ্তি" মার্কা জিনিষের পেছনে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সুনাম আর ক্রেতার প্রতি অকৃত্রিম সেবার মনোভাব।

জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালীর কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ প্রাইভেট লিঃ
১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পেটেণ্ট নং ৬২৩৫৪

KALPANA.BN

কেশ সজ্জা ও
কবরী রচনা...

যুগ যুগ ধরে নারীর মনে জেগে রয়েছে
একটী আকাংখা—নিজেকে
আরও রমণীয় ক'রে তোলা।

অর্ধ শতাব্দীর বেশী বেঙ্গল
কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল অভিজাত
মহিলাগণের কেশ সৌন্দর্য
বর্ধনে ও কেশ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের
জন্য সমাদৃত হয়ে আসছে।

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

কোলে গ্লুকোস বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

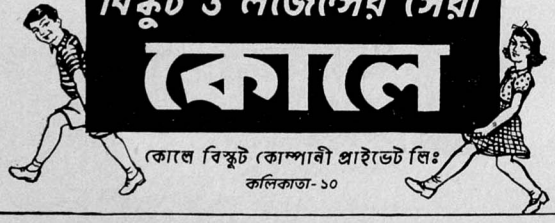

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বাংলা তাঁতের কাপড়
বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়
নিম্নলিখিত বিক্রয়কেন্দ্রগুলি
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত

১। ২১, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা-১৩
২। ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা-২৯
৩। ১২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
৪। ১৮এ, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সাঁওথ হাওড়া

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

গুজরাটের যেখানেই যান না কেন আপনার
ভ্রমণের আনন্দ বাড়িয়ে
তুলবে **উইল্‌স্ গোল্ড ফ্লেকের** ভরাট
সুমিষ্ট সুবাস

গোল্ড ফ্লেকের চেয়ে ভালো...
সিগারেট কোথায় পাবেন ?

উইল্‌স্-এর

৪'০০ টাকায় ৫০টি
১'৩০ টাকায় ২০টি, ৮০ নঃ পয়সায় ১০টি

দি ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড দ্বারা প্রচারিত

GF/569

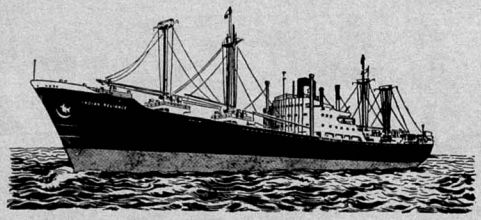

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কণ্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১

ফোন : ২৩ - ১১৭১ (৮টি লাইন)

সঞ্চয়ের অভ্যাস শিশুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে তাদের নিজেদের টুকিটাকি বহু জিনিস সঞ্চয় ও সংরক্ষিত করে রাখতে চায়। এই অভ্যাসটি মূল্যবান—আপনার সন্তানকে এই অভ্যাসের বিকাশে সাহায্য করুন। একটি 'চিলড্রেন্স ডেফার্ড' পলিসি নিন।

এটি অত্যন্ত স্বল্প মূল্যের একটি জীবন বীমার পলিসি যা কোন পিতাকে তাঁর সন্তানদের মিতব্যয়িতার প্রাথমিক শিক্ষা দিতে সাহায্য করে।

কি ভাবে এটির কাজ হয়? যেমন ধরুন, কোন পিতা তাঁর ২ বছর বয়সের সন্তানের জন্য মাসে মাত্র ১২ টাকা করে প্রিমিয়াম দিয়ে একটি ১০,০০০ টাকার পলিসি নিতে পারেন। যখন শিশুটির বয়স হবে ১৮ বছর, তখন সে অধিকারী হবে ১০,০০০ টাকার এই অনুপম পলিসিটির—যেটি স্বল্পতম মূল্যে কেনা হয়েছে এবং যেটি সে একই রকম নিম্নহারে প্রিমিয়াম দিয়ে চালু রাখতে পারবে।

একটি 'চিলড্রেন্স ডেফার্ড' পলিসি নিন—এটির তাৎপর্য হ'ল আপনার ছেলের জন্য স্বল্পতম মূল্যে নিরাপত্তার আদর্শ ব্যবস্থা এবং মিতব্যয়িতার শিক্ষা। জীবন বীমার কোন এজেণ্টের কাছে এ বিষয়ে বিশদভাবে জানুন।

জীবন বীমার
কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC-69 A-BEN

નવેનગરથી ચોળ ચૂંદડી વાપરી,
આવી રે અમારલે દેશ રે વો'રા રે દાદા ચૂંદડી !
ચૂંદડિયુંને ચારે છેડે ઘૂઘરી,
વચમાં તે આળેખ્યા ઝીણા મોર રે વો'રા રે દાદા ચૂંદડી !
સોએલું તો ઘમકે રૂડી ઘૂઘરી,
ઓઢેલું ત્યાં ટહૂકે ઝીણા મોર રે વો'રા રે દાદા ચૂંદડી !

নব-বধূর উপযোগী একটি উপহার

এই জনপ্রিয় বিবাহ গীতিটির মূল কথা হ'ল গুজরাটের বিখ্যাত বন্ধনী শাড়ী।

বিয়ের কনে তার দাদুকে বলছে,"নবনগর থেকে আমাকে একখানা বন্ধনী শাড়ী এনে দাও। এটিতে যেন ময়ূরের নক্সা থাকে এবং পাড়ে ছোট ছোট ঘুঙুর দেওয়া থাকে। তা'হলে আমি যখন শাড়ীটির ভাঁজ খুলতে থাকবো তখন নূপুর বেজে উঠবে, তারপর যখন এটি পরবো ময়ূরগুলি তখন আনন্দে গান গেয়ে উঠবে।"

ALL INDIA HANDLOOM BOARD

হাতের তাঁতের শাড়ী

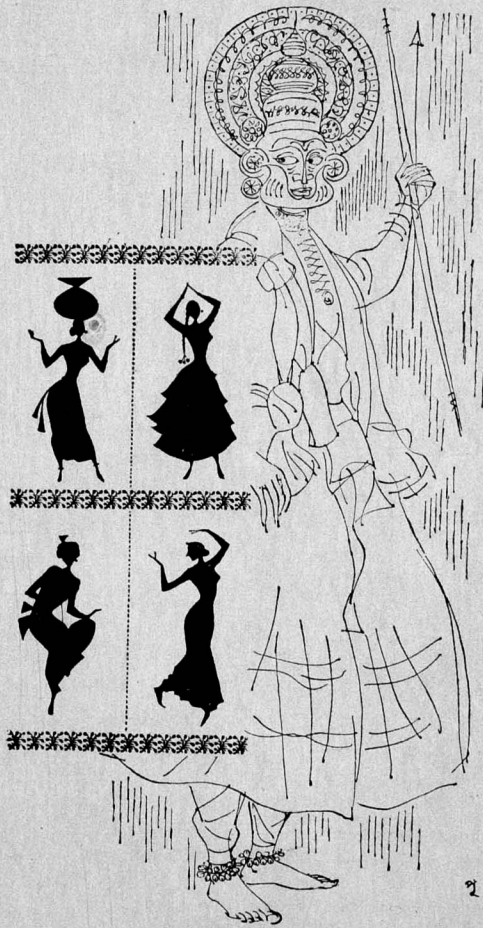

জাতীয় ঐতিহ্য

DA 61/194

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-বাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক সংকলন-গ্রন্থ।

আগামী শারদীয় বিশেষ সংখ্যাটি আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য-কলার একটি অপূর্ব অ্যালবাম্।

অনতিপূর্ব অংগসজ্জা। লাইনোয় ছাপা। অজস্র একরঙা এবং বহু রঙা ছবি। মুদ্রণ পারিপাট্যে, রচনার শ্রেষ্ঠত্বে এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য চিত্রের সংযোজনায় শারদীয় 'সুন্দরম্' অন্যান্য বছরের চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট আরও আকর্ষণীয় প্রমাণিত হবে।

প্রথম খণ্ডে আছে—

- **এ-যুগের যে সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত প্রতীচ্যের ভাস্কর নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত তাঁদের চিন্তাধারার প্রতিফলন পাওয়া যাবে বিখ্যাত প্রগতীশীল ভাস্কর, অধুনা কোলকাতাস্থ ডিজাইন সেণ্টারের অধিকর্তা প্রভাস সেনের প্রবন্ধ :** 'প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যে'। প্রবন্ধটি শোভিত হবে অসংখ্য ছবিতে।

- ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, শ্যাম, ইতালী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের অগণিত চিত্র-নিদর্শন দেখা যাবে দু খণ্ডে সমাপ্ত এই সংকলন গ্রন্থে।

- **বিশেষ আকর্ষণ : বিদেশের স্টুডিও-র অভ্যন্তরে মডেলসহ কর্মরত শিল্পীর সৃষ্টিমুহূর্তের নিভৃত ও রঙিন ছবি।** কৃষ্টি ও শিক্ষার ধারক বাংলার প্রত্যেক প্রগতিশীল পাঠাগারে ভাস্কর্য-কলা **তথা সংস্কৃতির তথ্য-পঞ্জী (রেফারেন্স)** হিসাবে রাখার যোগ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—

- শ্রীঅরবিন্দের ভাস্কর্য-কলা সম্পর্কে একটি অমূল্য রচনার অনুবাদ। অনুবাদ কোরেছেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষ।

- **এরপর আছে ভারতের রোঁদা স্বনামধন্য ভাস্কর শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর** দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক ভাস্কর্য সম্পর্কে লেখা মূল্যবান প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অজস্র ছবির দ্বারা অলংকৃত হবে।

- **'ভাস্কর্য-কলার মর্মকথা'—অবনীন্দ্র-শিষ্য অসিতকুমার হালদার লিখিত একটি দীপ্ত-রচনা।** এ যুগের ক্ষুদ্রাকার ভাস্কর্যের—মিনিয়েচার স্কাল্‌পচারিং-এর স্রষ্টা হিসাবে অসিতকুমার হালদারের পরিচয় অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত। তাঁর কৃত ক্ষুদ্রাকার ভাস্কর্যের কয়েকটি ছবিতে সুসজ্জিত হবে তাঁর প্রবন্ধ।

- **এ-ছাড়া ভারতের অগ্রগণ্য ভাস্কর** যথা—হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, রামকিংকর বেইজ, শংখ চৌধুরী, চিন্তামণি কর, সুধীর খাস্তগীর, রবীন রায়, প্রদোষ দাশগুপ্ত, বাসব ঠাকুর, সুনীল পাল প্রমুখ ভাস্করদের জীবনী, লেখা, তাঁদের কাজের নিদর্শন ও প্রতিকৃতি সহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

- **সুন্দরম্ পঞ্চাশ হাজারি থান ইণ্টক মার্কা পত্রিকা নয়।** সুন্দরম্ নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হোয়ে থাকে—কৃষ্টিবানদের জন্য। সেই কারণে অবিলম্বে নাম তালিকাভুক্ত কোরে না রাখলে না-পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতি খণ্ড দাম : তিন টাকা। দু খণ্ডে সমাপ্ত।

[illegible]তি খণ্ড এক সঙ্গে পাঁচ কপি নিলে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন।

সুন্দরম্ কা[illegible]র : ৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭নং চৌরঙ্গি রোড। কোলকাতা : তেরো।

টেলিফোন : ২৩-৮৬০২ ও ২৩-৯৭৭৭

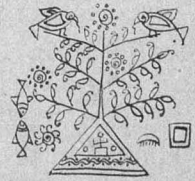

সুন্দরম্। পঞ্চম বর্ষ। তেরশো আটষট্টি। তৃতীয়—দ্বাদশ সংখ্যা।

সূচীপত্র

নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ	সুধীর নন্দী
বাংলার নব্যরীতির চিত্রকলা	অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কান্নার গন্ধ	অমরেন্দ্র ঘোষ
শিল্পী পল ন্যাস	অংশুরঞ্জন সেন
শিল্পদীপঙ্কর	সন্দর্শন চক্রবর্তী
প্রদর্শনী পরিক্রমা	শঙ্কর দাশগুপ্ত
খবরাখবর	ফণীভূষণ আচার্য। নিজস্ব সংবাদদাতা

অঙ্গসজ্জা | রণেন আয়ণ দত্ত

নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

ডঃ সুধীর নন্দী
মৌলানা আজাদ কলেজের দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ নিবন্ধাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত। এ সম্পর্কে বহু পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

মহাকবির জীবনক্রান্তি এবং সৃষ্টিক্রান্তি দুই ভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী এ তত্ত্ব কবির কথনসিদ্ধ। সংখ্যাতীত কবিতা এবং গানে কবি-প্রতিষ্ঠা আপনাকে প্রকাশ ক'রেছে। আবার কবির প্রবন্ধ শিল্পচর্যা রং এবং রেখার আশ্রয়ে সুধীজনের সাধুবাদ পেলো। বিদেশী সমালোচকেরা প্যারী চিত্রপ্রদর্শনীতে কবিকে তাঁর সৃষ্টি কর্মের জন্য যে স্তুতিবাদ ক'রলেন তা কবির মহৎ শিল্প সৃষ্টির যোগ্য হ'য়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসেবে দেশে দেশে অভিনন্দিত হোলেন। অবসর বিনোদনের জন্য কবির এই রং-তুলি নিয়ে খেলা। সে লীলা সুধীজনের প্রশংসাধন্য হোল। খ্যাতি কৈরবী কবি-জীবনের নতুন দিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রে দিলো। মহাকবি মহৎ চিত্রকরের কেতুযষ্টি বহন ক'রলেন জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়। যেটস্, রোথেনষ্টাইন প্রমুখ কলারসিকেরা একদিন কবির ললাটে যে রাজটীকা এঁকে দিয়েছিলেন তার পূর্ণমর্যাদা দেওয়া হোল প্যারী মহানগরীর চিত্রপ্রদর্শনীতে। মহাকবি চিত্রশিল্পী ব'লে খ্যাত হোলেন।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর মত মহৎ শিল্পীর শিল্পদর্শন প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা ক'রে এ কথাই আমাদের মনে হ'য়েছে যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যদি কোনও দূরাশ্রিত সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হন তবে সে সম্বন্ধটা হোল বিরোধের সম্বন্ধ। কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের

মধ্যে মিলোমিশে এক হ'য়ে যায়নি। দার্শনিক যা বলছে কবি তা বলেন নি; দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বকথা আমাদের শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী বার্তা আমাদের পরিবেশন ক'রেছেন। তাই আমরা সাম্প্রতিককালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং দার্শনিকের সমন্বয়তত্ত্ব১ গ্রহণ ক'রতে পারলাম না। এই যে কবি ও দার্শনিকের বিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুপ্রত্যক্ষ, এর মূলে রয়েছে জীবন ও জগতকে নৈর্ব্যক্তিকে ও প্রত্যক্ষ পথে বিচারপন্থীতির সঙ্গে ভক্তিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারপন্থীতির সমন্বয় প্রচেষ্টা।২ এই সমন্বয় ঘটেনি; সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বারবার রবীন্দ্রনাথ আপনার ভিতরকার কবির সঙ্গে দার্শনিকের মতবিরোধটুকু দেখবার সুযোগ বোধ্য পাঠককে দিয়েছেন। কবির যে বিশ্বাস তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের অন্তর্ভুক্ত তার প্রকাশ যে শিল্পে ঘটবেই, এটা আবশ্যিক সত্য নয়। শিল্পে কবির অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিকরণ ঘটে। শিল্প হোল আত্মানুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। সেখানে ধ্যানধারণা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা অবান্তর, অতিরিক্ত। কাজে কাজেই কবি এবং দার্শনিকের মতবিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেলে তার দ্বারা কবি রবীন্দ্রনাথ বা দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাহানি ঘটে না। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজয়ী। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনও বহুজন প্রশংসিত। সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সমালোচক অগ্রগণ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। গ্যেটে, কোলরিজ, ওয়ার্ডস্বার্থ এবং শেলীর সমানধর্মী সমালোচক ব'লে চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।৩ সে অভিনন্দন অতিকথন বা অনৃতভাষণ দোষে দুষ্ট নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মিল না ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবির সঙ্গে মিস্টিকের মালাবদল ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং মিস্টিকের এই মিল প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। কবির ভগবান তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সপ্ত স্বর্গের অত্যুচ্চ শিখরলোক থেকে নেমে আসেন; দেবতা কবির দ্বারে বারবার প্রার্থী হ'য়ে আসেন। কবি পরম নির্ভরতার সঙ্গে বলেন তাঁর দেবতাকে 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে'। মিস্টিক রবীন্দ্রনাথের ওপরে এতদ্দেশীয় বাউলদের প্রভাব অতিগোচর। মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ যে দর্শনে বিশ্বাস ক'রেছেন তা হ'ল ব্যক্তিনির্ভর (সাবজেকটিভ) দর্শন। এই দর্শনমত উপনিষদ থেকে তার প্রাণরস আহরণ ক'রেছে।

নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রেও কবিগুরু এই ব্যক্তিনির্ভর দর্শনমতের প্রচার ক'রেছেন। সুন্দরের লীলা আমার জন্য; আমি সে লীলায় আনন্দিত হই। আমার চেতনায় সুন্দর সত্য এবং শাশ্বত। গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে, তা গোলাপ ফুলে নেই; তা আছে আমার অনুভূতিতে। সুন্দরের এই ব্যক্তিসাপেক্ষ অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হ'য়েছেন এ যুগের অন্যতম বিজ্ঞানী-প্রধান আইনষ্টাইন। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্যকেও যখন ব্যক্তিসাপেক্ষ বললেন তখন আইনষ্টাইন তাঁর মতের বিরোধিতা ক'রে বললেন যে সত্য ব্যক্তিনির্ভর নয়। আইনষ্টাইন বললেন, সত্যের এই ব্যক্তি বা জ্ঞাতা—অনির্ভর সত্তাটুকু তিনি প্রমাণ ক'রতে পারবেন না। তবে এ বিশ্বাসটুকু তাঁর ধর্ম।৫ সুন্দরের এই ব্যক্তিসাপেক্ষ সত্তায় আস্থাবান হোলেও শিল্পের অসংজ্ঞেয় প্রকৃতির ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে কবিকে বহুবারই স্ববিরোধী উক্তি ক'রতে হ'য়েছে। শিল্পের এই দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প হোল মায়া। দ্বৈতবাদী মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলে গণ্য ক'রেছেন, তাই তাঁর কাছে জগত মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হোল মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ। তিনি শিল্পকে 'মায়া' বলেছেন শিল্পের অসংজ্ঞেয় স্বভাবটুকু নির্দেশ করার জন্য। শিল্পকে মিথ্যা বলা তাঁর অনভিপ্রেত। যা মানুষের আত্মিক শক্তির স্পর্শধন্য তা কখনই মিথ্যা হ'তে পারে না।

১ 'শিল্পালিপি' গ্রন্থে ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্তের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২ প্রমথনাথ বিশী প্রণীত 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থের পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য।

৩ 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪ 'ফিলজফি অব রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৫ 'I cannot prove that my conception is right but that is my religion.' (রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থের অ্যাপেনডিক্স দ্রষ্টব্য)।

ভারতীয় শিল্পের উদার গাম্ভীর্য শিল্পীর আত্মিক শক্তির স্পর্শধন্য বলেই তার আবেদন যুগ থেকে যুগান্তরেও সত্য হ'য়ে রয়েছে। 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে কবি শিল্পীর এই শিল্পকর্মে ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বললেন : 'পূর্ব গোলার্ধের বিস্তৃত অংশ জুড়ে যে বিরাট সৃষ্টি প্রচেষ্টা পাথরের গায়ে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করলো হাজারো বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে তা 'শিল্প কী' এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। শিল্প হোল মহাসত্তার আহ্বানে মানুষের সৃষ্টিশীল মনের প্রত্যুত্তর।' অতএব শিল্প বা আর্ট হ'ল মানুষের সৃষ্টিশীল আত্মার প্রকাশ। এই শিল্পকে প্রকৃতির অনুকৃতি বলা চলে না। প্রকৃতির রূপে আর শিল্পের রূপে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই রাধাকৃষ্ণণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন আলোচনা ক'রতে গিয়ে প্রকৃতিধর্মী কাব্য এবং যথার্থ কাব্যে প্রভেদ ক'রলেন। কাব্য হোল প্রকৃতির আদর্শায়িত রূপ। শিল্পকে প্রকৃতির আদর্শায়িত রূপ বললে স্লেটো কথিত শিল্পের বিরুদ্ধে 'অনুকৃতি'র অভিযোগ আর টেঁকে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হোল প্রকাশ। শিল্পী জীবনের দুঃখ-সুখ, আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তারই বর্ণবৈচিত্র্যে আপন সৃষ্টিকে উজ্জ্বল এবং বর্ণময় ক'রে তোলে। চারপাশের আলোহাসি দুঃখ অন্ধকার ভরা পরিবেশ শিল্পী মানসকে উদ্দীপিত করে, কবির অনুভূতিলোকে আলোড়ন জাগে; এই আলোড়নের পরিশোধিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শিল্পকে প্রাণ দেয়। আপন অন্তর-লোকের নিভৃত নিকেতনে শিল্পী একক অসংগ।৬ সেখানে গোপনে গোপনে শিল্পীমনের কারখানায় কতনা রূপ পরিগ্রহ ক'রছে বাইরের প্রকৃতি থেকে আনা শিল্পের বিষয়বস্তু। তারা যখন শিল্পীর মনের প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে বার মহলের দরবারখানায় বিচিত্র বেশে আবির্ভূত হয় তখন তাদের নিত্যদিনের দেখা সাজ-পোশাকের বদল হ'য়েছে। তারা বিচিত্র, তারা অভূতপূর্ব হ'য়ে দেখা দিয়েছে। শিল্পের খাস দরবারে, তাদের যে রূপ সে রূপ প্রকৃতিতে অলভ্য ছিল। এই রূপটুকু শিল্পীর দেওয়া। শিল্পীর দেওয়া এই রূপের আলোতেই শিল্পজগৎ উদ্ভাসিত। যে বিষয়বস্তুকে শিল্পী রূপ দিল সেটা কিছুই নয়, এমন কথা কোন কোন দার্শনিকও বললেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন যে রূপের আলোটুকু যেমন সত্য, রূপ যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে তাও সত্য। তবে শিল্পরূপ হোল মুখ্য এবং শিল্পের বিষয়বস্তু হোল গৌণ। তিনি কবি কীটসের 'বিউটি ইজ ট্রুথ' এই খণ্ড পংক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে বললেন যে শিল্পের সত্য হোল রূপাশ্রয়ী, এ সত্য রূপের ট্রুথ;৮ বস্তুগত বা বাস্তব সত্য সুন্দর নয়। বাস্তব যখন শিল্পীর দেওয়া সাজপোষাক প'রে আসে, তখন তাকে আমরা সুন্দর বলবো। এই রূপের মাধ্যমেই শিল্পীমানসে তার পারিপার্শ্বিক কী ভাবে প্রতিক্রিয়া ক'রছে তা আমরা বুঝতে পারি। যাঁর রসবোধ যত উচ্চগ্রামে বাঁধা তাঁর মানস প্রতিক্রিয়া তত বিচিত্র, তত বর্ণবহুল হবে। তাঁর দেওয়া রূপ ততই ঐশ্বর্যবান, ততই সুন্দর হবে। একই সূর্যোদয় হাজারো শিল্পীকে হাজারো বর্ণের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত ক'রেছে। শিল্পীর বিষয়বস্তু এক হোলেও বিভিন্ন রূপের জন্য বিভিন্ন সৃষ্টি নানান রকম মূল্যে বিকোয়। শিল্পরসিকের কাছে রূপটাই সত্য। তাই তার চোখে বিষয়বস্তুর ঐক্যটাই বড় নয়। রূপগত বিভেদটাই বড়।৯ রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন :

'Things are distinct not in their essence but in their appearance; in other words, in their relation to one to whom they appear. This is art, the truth of which is not in substance or logic but in expression.'

অর্থাৎ শিল্পীর চোখে বস্তুর যে রূপটা ধরা প'ড়ে শিল্পে প্রতিভাত হয়, শিল্পী যে রূপটাকে প্রকাশ করেন সেইটা হোল সত্যরূপ। এই রূপের নমনীয়তা নির্ভর করে তার প্রকাশের ওপর। সুতরাং প্রকাশটাই মুখ্য;১০ প্রকাশিত বিষয়বস্তু একেবারেই গৌণ। সাহিত্য মহৎ আইডিয়া বা ভাব ছাড়াও সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু

৬ 'সাহিত্যের স্বরূপ', পৃঃ ৬১।

৭ উদাহরণ স্বরূপ ক্রোচের নাম করা যেতে পারে।

৮ 'সাহিত্যের স্বরূপ', পৃঃ ৯।

৯ 'কনটেম্পরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' গ্রন্থে তাঁর 'রিলিজিয়ন অব অ্যান আর্টিস্ট' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০ 'সাহিত্যের পথে', পৃঃ ১৭১।

সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যতিরেকে কোন বিষয়বস্তুই 'সাহিত্য' পদবাচ্য হ'তে পারে না। যে গাছের বাড় বৃদ্ধি হোল না তাকে গাছ বলা যায়, কিন্তু যে বীজ অঙ্কুরিত হোল না তাকে তো আর গাছ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নীরব কবিকে সেই কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন যাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়নি। এখন এই কাষ্ঠখণ্ডকে যেমন 'অগ্নি' বলতে পারি না ঠিক তেমনি ভাবেই নীরব কবিকেও কবি বলতে পারিনা। সীমাহীন আকাশের উদার সৌন্দর্য দেখে যে আকাশের মতই নির্বাক হ'য়ে থাকে তাকে তো আর শিল্পী বলা যায় না। শিল্পীর অনুভূতির প্রকাশ থাকা চাই। শিল্পজগতে এই প্রকাশটাই বড় কথা। দার্শনিক ক্রোচে বলেছেন যে এই প্রকাশটুকুই শিল্পীর সর্বস্ব। যাঁর মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাব-ভাবনা আছে তিনি তা প্রকাশ ক'রবেনই। প্রকাশযোগ্য বিষয়বস্তু রইল অথচ তিনি তা প্রকাশ ক'রলেন না; এটা হতেই পারে না। একথা জোর গলায় বললেন নব্য ভাব বন্দী ক্রোচে। রবীন্দ্রনাথও শিল্পে প্রকাশকে মুখ্য স্থান দিলেন বটে, তবে তাঁর কাছে প্রকাশটাই সব নয়। প্রকাশ মুখ্য হোলেও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের প্রভেদ।

শিল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে সাহিত্যে প্রকাশটাই সব নয়। সাহিত্যে মানব চরিত্রের পূর্ণ এবং সার্থক প্রতিফলন হওয়া দরকার। মানুষের মন ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং অধ্যাত্মসত্তা নিয়ে তার সমগ্রতা। এই সমগ্র মানবসত্তার প্রতিফলন যে শিল্পে ঘটে তাই সার্থক শিল্প, রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের শিল্পকেই পূর্ণ মর্যাদা দেবেন। শিল্পী আপনার দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনার যথার্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে অথবা শিল্পীগুণোচিত সহানুভূতির দ্বারা অপরের আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার যথাযথ প্রকাশের দ্বারা সমগ্র মনুষ্যচরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা ক'রবেন। তবেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হবে। তা হ'লে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে মুখ্য বললেও শিল্পের বিষয়বস্তুকে সময়ে সময়ে স্থানবিশেষে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করাই হোল অনুষঙ্গ মাত্র।১১

এই শিল্প জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত; শিল্প জীবন থেকেই প্রাণরস আহরণ করে। ব্যক্তির মানসজীবন শিল্পে প্রতিফলিত হয়। শিল্পীর মনের নেপথ্যে যারা শিল্পসৃষ্টিতে সহায়তা করে, তা হোল বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং রুচিবোধ। এরা চুপিসাড়ে শিল্পসৃষ্টির কাজে জোগান দেয়। তাই তো শিল্প সাহিত্য এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।১২ এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেন যেন তাঁর মতে শিল্প-বস্তু হোল মানুষের সমগ্র চরিত্র। মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লোভ-সংশয় সমাকীর্ণ যে পশুপ্রবৃত্তি তাও যেমন শিল্পের উপজীব্য তেমনি মানুষের দেবোপম নিবৃত্তিও শিল্পে সমানভাবে কাম্য। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে এমন ধারণা সহজেই হ'তে পারে। আবার তিনি এর বিপরীত মতের পোষাকতাও ক'রেছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন যে, শিল্পলোকে মনুষ্য চরিত্রের সবটাই প্রকাশাধিকার পাবে না। মানুষ যা হ'তে চায়, যে চরিত্র-উৎকর্ষ মানুষের কাম্য সেটুকুই শিল্পে প্রকাশের যোগ্য। যে মানুষ স্বভাবধর্মে সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধিত্ব ক'রতে পারে তাকেই শিল্পে প্রকাশ করতে হবে। প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ধ্রুবগুণে যে মানুষ ঐশ্বর্যবান তাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পলোকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্তর গুণাবলী এবং জীবনের বৃহত্তম এবং দুর্লভতর অভিজ্ঞতার প্রকাশ যদি শিল্পে ঘটে তবে শিল্পের শাশ্বতমূল্য বেড়ে যাবে এবং যুগযুগান্তরের রসিক মানুষের কাছে সে শিল্পের আবেদন কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না। আমাদের চরিত্রের মহত্তর দিকটা শিল্পে প্রতিফলিত হোলে, জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে দুর্লভ অভিজ্ঞতার প্রকাশ শিল্পে ঘটলে তা সর্বজনবোধ্য এবং সহজবোধ্য হবে কী না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিল্প যদি সর্বজনবোধ্য করার দিকে শিল্পীর লক্ষ্য থাকে তবে জীবনের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা সে শিল্পে থাকবে তার আবেদন সর্বগণ্য হবে, এই সহজ সত্যটি শিল্পীকে স্মরণ রাখতে হবে। যে অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের অলভ্য এবং অলভ্য তাকে শিল্পের উপজীব্য ক'রলে তার আবেদন অস্পষ্ট হবে রসিকজনের কাছে। এ কথা আমরা বলেছি যে শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারিত হয় তার সার্থক প্রকাশ গুণে। শিল্পবস্তুর মহনীয়তা শিল্পকে কোন বিশেষ উৎকর্ষের অধিকারী করে না। এ রাজত্বে 'ক্যামেলিয়া' কবিতার সাঁওতাল রমণী এবং সাজাহান প্রেয়সী মমতাজ মহলের সমান মর্যাদা। এই লোকে মানুষের ভোজন-বিলাসিতার যেমন সমাদর তেমনি সমাদর তার হৃদয়ের প্রসারতা এবং চিত্তের ঔদার্য গুণের। যদি রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র মানবচরিত্রের উপর তলার গুণগুলোকে শিল্পের উপজীব্য ব'লে গ্রহণ ক'রে নীচের তলার প্রবৃত্তিগুলোকে শিল্পে অপাংক্তেয় ক'রে দেন তা হোলে শিল্পের বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। আমরা এমন সব শিল্পকর্মকে হারাবো যা বহুদিন রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি স্কটের 'আইভানো' নাটকের 'ব্রায়ান ডি বোয়া গিলবার্ট', ওথেলো নাটকের 'ইয়াগো' প্রমুখ চরিত্রকে শিল্পকর্ম বোলে গ্রহণ করতে দ্বিধা আসবে। কেননা এরা তো উন্নত মানব চরিত্রের প্রতিনিধি নয়। এমন কি কবি-সৃষ্ট অনবদ্য দুর্যোধন চরিত্রও শিল্পের উপজীব্য বোলে গৃহীত হ'তে পারবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে অপরকে বোঝানোর, রসাস্বাদন করানোর যে সমস্যা রয়েছে সে সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথ কথিত মহত্তর মানব-চরিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে না বোলে আমরা মনে করি। অন্যত্র তিনি যে সমগ্র মানবচরিত্রকে, শিল্পে প্রকাশযোগ্য বিবেচনা ক'রেছেন, সেই মতটাই যুক্তিসিদ্ধ। অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস এই মতটাই সমর্থন করে। আমরাও এই মত গ্রহণ করি। এই ধরণের আরো স্ব-বিরোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে রয়ে গেছে। জানি না রিয়ালিষ্ট-বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ কি না? তার সঠিক নিশানা পেলে কবির দর্শনচিন্তার স্ববিরোধিতার কোন বৃহত্তর অর্থ হয়তো পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ হেগেলীয় চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন এ কথা স্বীকার ক'রলেও এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কবি হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কোন কালেই আস্থাবান ছিলেন না। তবে একথা বোধহয় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন হেগেলীয় শিল্পদর্শনের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণ প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে১৩ ঔপনিষদিক সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, এই মহৎ আনন্দই সকল সৃষ্টির লক্ষ্য। যে প্রকাশ শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ, যা হোল, শিল্পের সমার্থক, তা এই আনন্দের ব্যঞ্জনাই বহন ক'রে আনে। এই আনন্দই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু গতি, সব কিছু স্থিতির নিবৃত্তি। সুতরাং সার্থক শিল্প প্রয়াস এই আনন্দেই বিধৃত। এই আনন্দের পথেই শিল্পীর আত্মোপলব্ধি ঘটে। এই আনন্দই হোল আত্মার এবং পরমাত্মার মর্মকোষ। পরমাত্মা হোলেন আনন্দস্বরূপ। আবার জীবাত্মার এবং পরমাত্মার কোন মৌল প্রভেদ নেই। সুতরাং জীবাত্মার আত্মোপলব্ধি বললে হেগেলীয় পরমাত্মার আত্মোপলব্ধি বোঝাতে পারে কোন হেত্বাভাস না ঘটিয়ে। যে আনন্দ পরমাত্মার অঙ্গীভূত সেই আনন্দই জীবাত্মা লাভ করে শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমে। তাই প্রকাশ এবং প্রকাশকের আনন্দকে কবি সমার্থক মনে ক'রেছেন। শিল্পীর আনন্দ হোল বিশুদ্ধ, বিমুক্ত আনন্দ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সুখানুভূতি তাকে এ আনন্দের সমার্থক মনে ক'রলে ভুল করা হবে। আত্মার যেখানে বন্ধনমুক্তি ঘটে সেখানে এ আনন্দের আস্বাদন করা যায়। শিল্পে প্রকাশের মাধ্যমে আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটে। তাই শিল্পকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলা হয়েছে। শিল্পানন্দের সঙ্গে এই পরম আনন্দের কোন প্রভেদ নেই। বস্তুতঃ তারা সমার্থক। শিল্পানন্দের মধ্য দিয়ে আত্মার আত্মোপলব্ধি ঘটে। আত্মজ্ঞান আসে এই পথে। শিল্পমাধ্যমে হেগেলীয় আত্মোপলব্ধির ধারণা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত ক'রেছিল বোলে মনে হয়। আবার দার্শনিক ক্রোচের দ্বারাশ্রিত ছায়া রবীন্দ্র-চিন্তায় আমরা লক্ষ্য করি যখন তিনি বলেন যে শিল্পীর সার্থক প্রকাশ যাকে শিল্প বলে, তার মধ্যেও এই আনন্দের অবস্থিতি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রকাশকে মুখ্য স্থান দিলেন। এখানে ক্রোচের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আবার অন্যদিকে তিনি বললেন মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, যা কিছু শাশ্বত এবং চিরন্তন তাকেই শিল্পে স্থান দিতে হবে। শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব চরিত্রের ক্ষণিক নশ্বরতাকে গ্রাহ্য করা চলবে না এবং এই বৃহৎ বিষয়-বস্তুর কথা শিল্পীকে মনে রাখতে হবে। প্রকাশই

১১ 'সাহিত্যের পথে', পৃঃ ১৭১।

১২ 'সাহিত্যের পথে', পৃঃ ১৬৩।

১৩ 'সাহিত্য', পৃঃ ৬৪।

একমাত্র সত্য নয়। এক্ষেত্রে হেগেলীয় প্রভাব; অস্বীকার করার একেবারেই কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সাহিত্যে এবং শিল্পে কবির ব্যক্তিত্ব বা 'পারসোনালিটি' কী ভাবে প্রকটিত হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতবাদের বিস্তৃততর পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ একথা আমাদের বললেন যে, শিল্পে বা সাহিত্যে শিল্পীর 'অনুভূতিমাত্র' প্রকাশ পায় না, শিল্প কেবলমাত্র পলায়মান অধ্রুব সাময়িক অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্র রূপে দেখা নয়। এই অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিচারিত্রের নিবিড় যোগ রয়েছে। নব্য ভাববাদী ক্রোচের মত রবীন্দ্রনাথ অনুভূতিকে ব্যক্তিচারিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বলে মনে করেননি। আমাদের অনুভূতির বিচিত্রতা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে থাকে। শিল্পীর শিল্পকর্ম শুধু তার অনুভূতিরই রূপায়ণ নয়। শিল্পে শিল্পচরিত্র আপনাকে উদ্ঘাটিত করে। শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ছাপ রেখে যায়।১৪ কবির এই ব্যক্তিত্ব ধারণার মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি, অনুভব, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাখ্যান এবং অভিজ্ঞতার সীমাহীন বিস্তৃতি বিধৃত। জীবাত্মার পারস্পরিক প্রভেদটুকু এই ব্যক্তিত্ব ধারণার দ্বারা চিহ্নিত। এই ব্যক্তিত্ব শিল্পে আপনাকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে'তে বললেন যে সেক্ষপীয়রের বহু বিচিত্র চরিত্রচিত্রণে সেক্ষপীয়রের ব্যক্তিত্ব আপনাকে প্রকাশ করেছে। আবার তিনি সাহিত্যে বললেন যে, দান্তের কবিতার সঙ্গে তাঁর জীবন ওতোপ্রোতভাবে মিশে গেছে। সাহিত্য এবং জীবনকে পুরোপুরি বুঝতে হোলে এ দুটিরই অনুধ্যান অত্যাবশ্যক। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বোঝা যায় না, আবার সাহিত্যকে বাদ দিলে সাহিত্যিকের জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'কবিকে পাবে না তার জীবনচরিতে।' জীবনীকার জীবনের আকস্মিক ঘটনার মালা সাজিয়ে দিলেই তাতে প্রাণের স্পর্শ এসে লাগে না। যে প্রাণ-প্রেতি, বিচিত্র সজ্জায় জীবনকে সজ্জিত করে তার স্পর্শ এসে লাগে না কবির জীবন কথায়। সে স্পর্শ থাকে তার শিল্পে, তার সৃষ্টিতে। শিল্পীর সমগ্র চরিত্রের ভাষ্যকার হোল তার শিল্প। শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডলে শিল্প-রসিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। বোদ্ধা মানুষ শিল্পীর ব্যক্তি-চারিত্রের স্পর্শ পায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পে ব্যক্তি-চারিত্রের সমগ্রতার তত্ত্ব অনুধাবনযোগ্য। এর বিরোধী তত্ত্বেরও যে তিনি অবতারণা করেছেন সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'সাহিত্যে' তিনি বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে যা ধ্রুব, অবিনশ্বর যা সার্বিক এবং অনাকস্মিক তারই প্রকাশ শিল্পে ঘটে। এই ধ্রুব-চারিত্র-প্রকাশ তত্ত্বটি সমগ্র-চারিত্র-প্রকাশ-তত্ত্বের বিরোধী। কেননা আমাদের চারিত্রিক সমগ্রতা ধ্রুব, অধ্রুব এই উভয়বিধ গুণ এবং বৃত্তি সমন্বয়ে গঠিত। অতএব কবিকথিত উভয়তত্ত্বই গ্রাহ্য করা চলে না। এই বিসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করা চলে না পূর্বে উল্লিখিত ক্রোচে-হেগেল তত্ত্বের প্রভাব দ্বারা। ক্রোচীয় প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষণিক অনুভূতিকে শিল্পে আসন দিলেন; আবার হেগেলীয় প্রভাব তাঁকে মানুষের মধ্যে যা কিছু শাশ্বত এবং অবিনশ্বর তাকে শিল্পে প্রাধান্য দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল।

শিল্পে শিল্পীচরিত্রের সমগ্রতা অর্থাৎ একদিকে তার দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য অন্যদিকে প্রীতি, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা, এইসব পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ এবং প্রবৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে, এই তত্ত্বে আস্থা হয় না। তবে এ প্রশ্ন ওঠে যে, কেমন করে একই শিল্পীর হাতে দেবতা এবং দানবের অনবদ্য চারিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়। শিল্পীর মানসিক প্রবণতা যে-দিকে, তার চরিত্রের বনিয়াদ যে ধাতুতে গঠিত, সেই ভাবেই তার শিল্প রূপ পাবে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয় যে একই কবির কাব্যে ভিন্নধর্মী প্রবণতা প্রকট হয়; একই নাট্যকারের নাটকে ইয়াগো এবং ইমোজেন সৃষ্ট হয়; একই কাহিনীকারের কাহিনীতে দুর্যোধন এবং গান্ধারী সমান উজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক সমালোচকেরা একে ব্যাখ্যা ক'রবেন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তি-বিচ্যুত তত্ত্বের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ—কীটস, এলিয়ট, ক্রোচে প্রবর্তিত পথের পথিক নন। তিনি বললেন যে, শিল্পীমানসের সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ এই অসাধ্য সাধন করে। শিল্পী একদিকে যেমন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন অন্যদিকে সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। একদিকে যেমন শিমুল-সজিনার সঙ্গে আপনার নিবিড় আত্মীয়তাটুকু কবি উপলব্ধি করেছেন, ধূলি-তৃণ-জলে আপনার যুগ-যুগান্তরের অবস্থাটুকু অনুভব তেমনি করেছেন। ময়ূরের সঙ্গে গর্বিত হ'য়েছেন অন্যদিকে আবার আদিগন্ত-বিস্তৃত ধরণীর মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন পরম পরিতৃপ্তিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পরিচয়টুকু এই বলে দিলেন যে, তিনি 'আমাদেরই লোক।' এই 'তোমাদের লোক' হ'বার সাধনাই শিল্পীর সাধনা। প্রেমের পথে, ভালবাসার পথে সমস্ত মানুষের জন্য শিল্পীর মনে সমবেদনা, সহমর্মিতা জাগে তাই শিল্পীকে সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অংশভাগী করে। সর্বশ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়। তিনি তাকে শিল্পে প্রকাশ করেন। যে ব্যথা যে বেদনা তাঁর অভিজ্ঞতায় ছিল না তিনি তার রসঘন করুণচিত্র অঙ্কিত করেন; যে স্বপ্ন তাঁর চিত্তাকাশের দিগ্‌বলয় সীমা নিত্য অতিক্রান্ত তার বহু বিচিত্র ছবি আমরা শিল্পীর লেখায় প্রত্যক্ষ করি। যে আনন্দে শিল্পী কোনদিন বিভোর হননি তার উত্তাল তরঙ্গ তাঁর সৃষ্টিকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। শিল্পীমন সর্বত্র হয়ে ওঠে এই সহানুভূতি ও সহমর্মিতার জন্য। এর জন্যে শিল্পে বিভিন্নধর্মী মানুষের বিচিত্র কলরব শ্রুত হয়; এইজন্যই মহৎ এবং অন্তজ শিল্পীর জগতে নিকট প্রতিবেশীরূপে বসবাস করে। উভয়েই রসধন্য হয়ে ওঠে শিল্পীর সত্য অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রে। কবির পরস্পর বিরুদ্ধ আবেগ প্রবণতাও মিথ্যা নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সততাকে শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসেবে দেখেছেন যদিও ক্রোচে প্রমুখ নন্দন তত্ত্ববিদেরা শিল্প সততাকে (আর্টিস্টিস সিন্‌সিয়ারিটি) প্রকাশ সততা অর্থে গ্রহণ করেছেন। শিল্পী যা বলেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস তা আত্যন্তিক বোধের ভিত্তি যদি শিথিল হয় তা হোলেও শিল্পমূল্য ব্যাহত হবে না। 'প্রকাশ কর্মটি' শিল্পী সুষ্ঠুরূপে সমাধা করলে শিল্পীর প্রকাশ সততা প্রকট হোল। রোমা-রোলা ক্রোচে উক্ত এই প্রকাশ-সততায় বিশ্বাসী নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই শিল্পীর বিশ্বাস এবং ধারণার ঐকান্তিকতাকে শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসেবে দেখেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই আমাদের বলেছেন যে, অনুভূতির সত্যতা প্রকাশ সার্থকতায় নয়, তা শিল্পীর জীবনের মূলে প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্পীর সঙ্গে সামাজিকের সম্বন্ধের আলোচনার অবতারণা করব। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন সে সৃষ্টিকে যদি স্বতঃস্ফূর্ত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলতে হয় তা হোলে একথা আমাদের বললেই হবে, শিল্পী তার পারিপার্শ্বিক, তার সমাজ, তার সমকাল সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন থাকেন। সমাজের রুচিবান কৃষ্টিবান মানুষেরা 'আমাকে' বুঝবে। আমার দায়িত্ব হোল আমার সৃষ্টিকে তাদের বোধগম্য করা, একথা কী শিল্পী ভাবেন সৃষ্টির সময়ে? রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, স্রষ্টাকে তার সমাজের কথা, তার সমকালের কথা মনে রেখে সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হ'তে হবে।১৫ শিল্পী যাঁদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের রুচি এবং শিল্পবোধের দিকে শিল্পীকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ না করলে শিল্পের আবেদন সার্থক হবে না তাঁদের কাছে যাঁদের জন্য শিল্প সৃষ্টি করা হোল। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পীর প্রকাশ কর্ম হোল শিল্পীর অন্তর-লোকবাসী মহাভাবকে শিল্প মাধ্যমে সাধারণের গোচর করা; সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশন করতে হোলে সেই মহাভাবকে অনেকখানি সাধারণ ক'রে ফেলতে হবে। এতে মহাভাবের মূল্যহানি ঘটবে, তার মর্যাদার লাঘব হবে। শিল্পীর মহাভাবের এই সাধারণীকরণতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের শিল্প-বস্তু (কনটেন্ট) সম্পর্কিত তত্ত্বের সঙ্গে বিসঙ্গত হ'য়ে পড়ে। যদি শিল্পের লক্ষ্য হয় মানবচরিত্রের মহত্তর গুণাবলীর প্রকাশ তা হোলে শিল্পীর পক্ষে আর তার সমকালীন মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা মহত্তর চারিত্রধর্ম সাধারণের কাছে অস্পষ্ট অবোধ্য। শিল্পের উপজীব্য যদি মানুষের এই মহত্তর চারিত্রধর্মই হয় তা হোলে তার সঙ্গে শিল্পের সাধারণীকরণতত্ত্বের সমন্বয় ঘটানো যায় না। এখানেও রবীন্দ্র-শিল্প দর্শনে যে সঙ্গতি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা কবিজনোচিত হোলেও দার্শনিকজনোচিত নয়।

মহত্তর মানব-চরিত্রের সংবাদ সংবাদী এই যে শিল্প এ শিল্পের উৎস হোল মানুষের অবকাশের সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ যেখানে কাজের ভীড় নেই; প্রয়োজনের তাগিদ নেই, যেখানে জৈব-জীবটার সব দাবীকে অস্বীকার করা

১৪ 'সাহিত্যের পথে', পৃঃ ১৬৪ দ্রষ্টব্য।

১৫ বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হয়েছে। এই অতিরিক্তের রাজত্বেই শিল্পের জন্ম।১৬ বেদের ভাষ্যকার যজ্ঞশেষের অতিরিক্ত ছবিটাকে বললেন ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা; ব্রহ্মাই সৃষ্টির উৎস। এই অতিরিক্তটুকুই জীবনের যত সৌন্দর্য; যত সুষমার দ্যোতক। রসরাজত্বের সীমানা নির্দিষ্ট হয় এই অতিরিক্তের নিশানাটুকু দিয়ে। যেখানে প্রয়োজন নেই, চাহিদা নেই, চাহিদা মেটাবার দায়িত্বও সেখানে নেই। এই অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্রে, অতিরিক্তের রসরাজত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের এই শিল্প-তত্ত্বকথা তাঁর শিল্পদর্শনের উত্তরসূরী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুসৃত। অত্যাধুনিক কালে এর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে মার্ক্সবাদী শিল্পদর্শনের দুন্দুভিনাদকে ছাড়িয়ে।

১৬ রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অব অ্যান আর্টিস্ট' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ('কনটেম্পরারী ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' গ্রন্থ)

এক পশলা বৃষ্টির পরই,
নেমে আসে বন্ধুর আড্ডায়
প্রগল্‌ভ সন্ধ্যার আভা
চায়ের কাপের ঠাটে নিবিড় পূরবী।
কথা চলে—ভিজে চড়ুইদের ঠোঁটে
বাসাবাঁধার টুকরো কাটির সংগতি,
কথা চলে—শিল্পের
তোমাদের—মানুষের শিল্পের,
ভাস্কর্যের আশ্চর্য বিলাস—
পিকাসোর হাতে নামে আকাশের মেঘলা মোড়েই
ডানা-ভেজা বক, নীচে পীচ-মোড়া ভিজে ফিতে
বাঁকা রাস্তার—একটু আমেজ নিয়ে
দিনটা এক একগুঁয়ে মাতালের মত
ঢুকে পড়ে তোমাদেরই ঘন আড্ডায়।
এখানেও শিল্পায়িত সিগারেট-ধোঁয়া আর
সর্পিল মনন—,
রথীন্‌-নীরদ কিংবা গোপালের মন,
ক্রয়ডার-সুভো কিংবা ভ্যান্‌ গগ্‌, কারেল এপেল্‌—
মিশে যায় যামিনী রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রালী।
অদ্ভুত প্রাণের ছক—বাইরের আকাশেও—,
মনের পর্দায়—ভিজে গাছে—দূর-দীর্ঘ-ধূসরিত
জাহাজের প্রহরী মাস্তুলে।
অত্যন্ত বিশেষ এই বর্ষার সন্ধ্যাকে, অন্তরঙ্গ
প্রেয়সীর মত
সদ্যোস্নাত অলকের কামনায় ঘেরা—
চুম্বন জানাই।
কারণ, এখন শুধু বন্ধুরাই আছে—
আমার এ অনুভবের আনাচে কানাচে
আকাশের মেঘ-মূর্তি,
সোনা-গলা প্রদোষের ভাস্কর্য-লীলায়॥

স্মরণের অন্তরালে প্রায় চম্পট্‌-প্রদত্ত

—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

বাংলার নব্যরীতির চিত্রকলা

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ভারত-বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকই নন, ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ কোরেছিলেন। ইংরাজী ও বাংলায় শিল্পকলা সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। কলাবিষয়ক সুবক্তা।

নব্যবাংলার অন্যতম চিত্রকর শৈলেন দে অঙ্কিত : 'বিরহিণী যক্ষিণী'।

ভারতের আধুনিক চিত্রকলার সাধনায় আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন—অর্ধশতাব্দীর পর আজ আমরা তাহার সার্থকতা ও মহিমার কথা ভুলিতে বসিয়াছি। যদি কোনও রূপ-পদ্ধতিতে কালজয়ী সনাতনী শক্তি না থাকে, তাহা কালের রথচক্রের তলায় নিশ্চয়ই চূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইবে। কলা-সাধনার ইতিহাসে ইহা অকাট্য সত্য যে, যাহার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শক্তি নাই—তাহাকে কেবল প্রচারের বলে, সমসাময়িক প্রশংসার কৃত্রিম অবলম্বনে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। প্রাচীন গ্রীক শিল্পকলা, নবযুগের পূর্বগামী বাইজান্তাইন্ কলা-পদ্ধতি, মধ্যযুগের গথিক্ শিল্পীদের কলাকৃতি আধুনিক সমালোচকের সমীক্ষণ ও নির্মম বিচারে তাহাদের মহিমা ও মহত্ত্ব আজও হারায় নাই। দীর্ঘকালের বিচারে এইসব বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রীতির কলাসাধনার আদর্শ তাহাদের স্বকীয় আভ্যন্তরিক শক্তি উপরে সদর্পে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের কাল-জয়ী গুণাবলীর পতাকা উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে। মহাকালের সর্বগ্রাসী প্রবল ঝটিকা তাহাদের উচ্চ-শির অবনত করিতে পারে নাই। কিন্তু ইতালীর নবযুগের (রিনেসাঁসের) অনেক দাবী আধুনিক সমালোচনার আঘাতে তাহাদের মূল্য ও মহিমা হারাইয়া, ম্লান ও জ্যোতিঃহীন হইয়াছে। আধুনিক সমীক্ষণ সমালোচনার কষ্টিপাথরে, য়ুরোপের নানা যুগের কলাসাধনার মূল্যায়ণে তাহাদের সুখ্যাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস ক্লাইভ্ বেলের সুবিখ্যাত সন্দর্ভে নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই নূতন বিচারে, রাফেইল, করিজিয়ো নীচে নামিয়া আসিয়াছে এবং ডুবিয়ো, মাজ্জারিতন্ ও জিয়োত্তো উপরের স্থান লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভিক্টোরিয়া যুগের ইংলণ্ডের প্রি-রাফেলাইট্ গোষ্ঠীর আন্দোলনের সহিত আচার্য অবনীন্দ্রনাথের নূতন পদ্ধতির সাধনার কিছু সাদৃশ্য আছে। আধুনিক নূতন সমালোচনার নিষ্ঠুর আলোকে ইংলণ্ডের উক্ত গোষ্ঠীর কলাকৃতি অনেকটা ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে।

বাংলার নূতন পদ্ধতির কীর্তিকলাপ যাহা এককালে দেশে বিদেশে বহু প্রশংসার মাল্যচন্দন অর্জন করিয়াছে—আজ তাহা নূতন নির্ভীক সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষার কঠোরতার সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ-প্রশংসিত চিত্রাবলীর পুনর্বিচারের উপযুক্ত উপাদান আমাদের হাতের সম্মুখে বিদ্যমান নাই। অনেক উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ 'মাষ্টারপিস্' বিদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অনেক নিদর্শন ব্যক্তিগত সংগ্রহে আত্মগোপন করিয়া আছে, সাধারণের পক্ষে তাহা দেখিবার সুযোগ নাই। অবনীন্দ্রনাথের অনেক চিত্র রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে টিনের বাক্স-জাত হইয়া অবরুদ্ধ ও লুক্কায়িত রহিয়াছে। আধুনিক বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে না। অনেক বৎসর পূর্বে আচার্যের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র জাপানী ও বিলাতের এম্‌রি ওয়াকারের উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মুদ্রিত প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই উৎকৃষ্ট সঠিক প্রতিলিপিগুলি এখন পাওয়া যায় না। তাহার পুনঃ প্রকাশের কিম্বা নূতন পদ্ধতিতে নূতন সঠিক প্রতিলিপির ব্যবস্থা না হইলে পুনর্বিচারের নূতন শুনানীর (নিউ ট্রায়াল) সাক্ষপ্রমাণ ও উপযুক্ত দলিলের অভাবে নূতন মূল্যায়ণের পথ প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ অবনীন্দ্রনাথের অতিসূক্ষ্ম বর্ণ-ভঙ্গিমার স্বর্গীয় সুষমা ভারতে প্রচলিত স্থূল তিন রঙের হাফ্-টোন প্রতিলিপিতে ধরা পড়ে না। এ পর্যন্ত আচার্যের যতগুলি চিত্র এদেশে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার একখানিও আসল চিত্রের সৌরভ ও গুণাবলীর সঠিক প্রকাশে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং যত দিন না মূল চিত্রাবলী দেখিবার নূতন সুযোগের ব্যবস্থা হয়, অথবা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিলিপি সাধারণের সক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত করা যায়, আচার্যের চিত্র-সাধনার নূতন মূল্যায়ণের সুযোগ হইবে

নব্যবাংলার শিল্পী শৈলেন দে অঙ্কিত : 'মেঘদূত'।

না। তাঁহার দুইটি শিষ্যের চিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির ফটোগ্রাভ্যুয়ার (হাফ্-টোন্ নহে) এবং চার বর্ণে বিলাতে মুদ্রিত রঙিন কপিতে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইখানি সচিত্র পুস্তক 'মডার্ণ ইণ্ডিয়ান্ আর্টিস্ট' পর্যায়ের প্রথম ভাগ 'ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার', এবং দ্বিতীয় ভাগ 'অসিত-কুমার হালদার', এখন পাওয়া যায় না। গত বৎসরে শ্রীমতী ঠাকুরের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়াণ্টাল্ আর্ট—প্রাচীন প্রাচ্যকলা পরিষদের ক্ষীণ চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের কিছু কিছু চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত নূতন পদ্ধতির অলৌকিক নিদর্শনের এক-ভগ্নাংশও উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে, বোম্বাই ও দিল্লী সহরে অবনীন্দ্র-শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত সাধনাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার প্রচুর হীন প্রচেষ্টা চলিতেছে। সমকালীন চিত্র সাধনার ক্ষেত্রে যখন কোনও প্রতিভাবান (?) কলা-বিদ্ প্রশংসার দাবী লইয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যরা কিছুই করিতে পারেন নাই এই সুর লইয়া গাওনা সুরু করেন। যদি কেহ যথার্থ প্রতিভাশালী সাধক নূতন বাণী, নূতন ভাষা ও নূতন পদ্ধতি লইয়া উপস্থিত হন তিনি তাঁহার সাধনার উৎকৃষ্ট নিদর্শনের মারফৎ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমসাময়িক দর্শকের চিত্ত জয় করিবেন, অন্যকে গালা-গালি দিয়া যশঃ লাভ করিবার চেষ্টা অত্যন্ত হীন ও লজ্জাকর ব্যাপার। যিনি পূর্বসূরীদের গালি না দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না তাঁহার নিজের স্বকীয় কলা-শক্তির উপর নিজের বিশ্বাস ও ভরসা নাই এই কথাই তিনি প্রমাণ করেন।

সম্প্রতি একজন যশস্বী কলাশিল্পী অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর সাধনাকে 'সৌখীন ভারতীয় শিল্প—প্রাচ্য-শিল্পবাদ' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন ('বসুধারা', জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক)।

নব্যবাংলার শিল্পী শৈলেন দে অঙ্কিত : 'মা ও শিশু'।

অবনীন্দ্র-শিষ্য বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত : 'রাম ও গুহক চণ্ডাল'।

ভারতের কলাশিল্প প্রাচ্য-শিল্পবাদের পথেই চলিবে। তাহা অস্বীকার করা ভারতের সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ বলিয়া ধরিতে হইবে।

কথাটা হইতেছে ভারতের ভারতীয় চিত্রকর কোন ভাষায় চিত্র রচনা করিবেন, দেশের ভাষায় না বিদেশের ভাষায়? এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন প্রায় সত্তর বৎসর আগে একজন বিশিষ্ট রূপ-রসিক মঁসিয়ে মরিস্ মেঁন্দ্র।

ভারতের শিল্প ভারতীয় রূপ ও রীতি গ্রহণ করিবে, না অন্য কোনও রীতি অনুসরণ করিবে?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়াছেন আচার্য অবনীন্দ্র-নাথ দেশীয় ভাষায়, দেশীয় পদ্ধতি ও রীতিতে চিত্র লিখিয়া। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতের একটি নিজস্ব চিত্রের ভাষা আছে এবং সেই ভাষা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষা অপেক্ষা হীন নহে, অধিকন্তু অনেক বিদেশী ভাষা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান। সে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাকে আরও শক্তিমান এবং প্রকাশ রীতিতে আরও বড় করিয়া তোলা, আরও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা, প্রত্যেক ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর অবশ্য পালনীয় ধর্ম। জননী জন্মভূমি ও জন্মভূমির ভাষাকে বর্জন করিয়া কোনও মানুষই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারেন না।

ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষাকে বর্জন করা দেশ-প্রীতির বিরুদ্ধে মহাপাপ, দেশের বিরুদ্ধে মহাপাপ। এই মহাপাপ হইতে আমাদের ভারতীয় রূপকারদের রক্ষা করুন ভারতের প্রাচীন শিল্প-দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ কখনও বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেন নাই, বিদেশের নানা সাহিত্য হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা বর্জন করিয়া বিদেশী ভাষার আশ্রয় নেন নাই, কিম্বা বিদেশী ভাষার অনুকরণ করেন নাই। ভানুসিংহের কবিতাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ মধ্য যুগের বৈষ্ণব কবিদের রচনা-রীতি অনুসরণ ও আত্মসাৎ করিয়া-ছেন। কোনও বিদেশী কবির রচনা অনুকরণ করেন নাই। প্রথম যুগের রচনায় শেলী কীটসের কিছু কিছু ছায়া ও ক্ষীণ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাহারও অনুকরণ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মভূমির ভাষাকে, মাতৃভাষাকে পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া অলৌকিক রূপে ও শোভায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

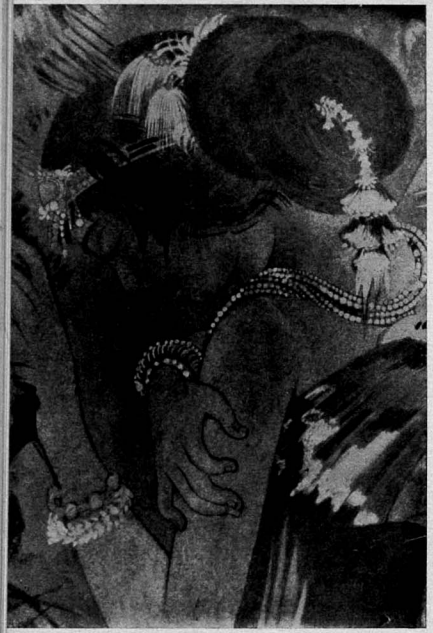

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অংকিত :
'উমার শোক'।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, মাতৃভাষাকে বর্জন করিয়া, কোনও রূপ জাতীয় সাধনার প্রকাশ-চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর।

বিদেশের কবিরা আপন আপন মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করেন না।

আমাদের দেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রধানতঃ তিনজন কবির রচনায়—তাঁহাদের একজন তরু দত্ত, একজন মনমোহন ঘোষ, এবং অন্যজন সরোজিনী নাইডু। এই মহিয়সী মহিলাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কংগ্রেসে যোগ দেবার পর আর আপনি কবিতা লেখেন না কেন?' উত্তরে তিনি তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'গাঙ্গুলী! তোমার মুখে এ প্রশ্ন সাজে না, কারণ আমি এ[illegible] কেন [illegible] না তার কারণ তুমি সকলের চেয়ে বেশী জান।' তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, জাতীয়তার পতাকা বহন করিয়া কেজো ব্যাপারে দায়ে ঠেকিয়া ইংরাজী বলা যদিও সাজে, কবির মনের কথার প্রকাশ মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় হওয়া অত্যন্ত অশোভন এবং মানসিক বিকার-গ্রস্ত বিজাতীয় বাতুলতা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও নৈষ্ঠিক ভক্তি এখনকার কালের অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবীরা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যদিও তাঁহারা নূতনত্বের দাবি লইয়া স্বকীয় পন্থা ও রীতিতে সাহিত্যের নব নব রূপ-সৃষ্টির পথে সাধনায় রতী হইয়াছেন। আমরা জানি যে 'রবীন্দ্রোত্তর যুগে' কতিপয় অতি-আধুনিক সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের পথ ও প্রকাশ-ভঙ্গী রীতি বর্জন করিয়া, নূতন নূতন পথে আত্ম-প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপের নবযুগের সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টিতে মৌলিকত্বের আমদানী করিবার নানা পরীক্ষা ও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই মৌলিকতার প্রয়াস বাংলা ভাষা ত্যাগ করিয়া কোনও সার্বজনীন এস্‌পেরেণ্টোর (Esperanto) ভাষার আশ্রয় নেয় নাই, বাংলাদেশের ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ অনুরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের রূপের ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া ভারতের কলামন্দিরে পরে পরে অনেকগুলি দীপ জ্বালাইয়া ভারতের কলা-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে এই দীপমালা-রচনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

অর্ধ শতাব্দীর সাধনায় তাঁহাদের জয়যাত্রার পথে যে কয়টি উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ উচ্চ-শিরে দীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের উচ্চতা সমসাময়িক কোনও রূপ-সাধকই অদ্যাপি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই কীর্তি-মালার কয়েকটির উল্লেখ মাত্র করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম :—

১) **আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'নির্বাসিত যক্ষ', 'যমুনা তটে রাধিকা', 'মহাকালের মন্দিরে নর্তকী', 'শিব-সিমন্তিনী', 'উষ্ট্রের শেষ-যাত্রা', 'আলম্‌-গীর', 'শ্রীকৃষ্ণের দাসখত' ইত্যাদি।

২) **সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি**—'লক্ষণসেনের পলায়ন', 'নারদ', 'শিব-পার্বতী'।

৩) **ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার**—'চৈতন্য ও ময়ূর', 'চৈতন্যের গৃহত্যাগ', 'রাধা', 'চৈতন্য ও রামানন্দ', 'রাস-লীলা', 'দান-লীলা', 'শকুন্তলা', 'গঙ্গা', 'যমুনা', 'চৈতন্যের নির্যাতন' ইত্যাদি।

৪) **ডাক্তার নন্দলাল বসু**—'সতী', 'কৈকেয়ী', 'সাবিত্রী ও যম', 'বিক্রম ও বেতাল', 'গান্ধারী', 'বাউল', 'ভরতের রাজত্ব', 'শিবের বিষ পান', 'শিব-তাণ্ডব', 'পার্বতীর প্রসাধন', 'উমার প্রত্যাখ্যান', 'গীতার অর্জুন' 'কৃষ্ণ ও সুদামা', 'শবরীর প্রতীক্ষা' ইত্যাদি।

৫) **অসিতকুমার হালদার**—'রাসলীলা', 'সুরের আগুন', 'দুর্দিনে', 'অশোক বনে সীতা', '(কুমারসম্ভবের) শিব ও পর্বতী' ইত্যাদি।

৬) **সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত**—'পদ্ম-আহরণ', 'নটরাজের মন্দিরে' ইত্যাদি।

৭) **দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী**—'বুদ্ধের নির্বাণ', 'জোড়া পাখী', 'অন্ধ বালক', 'মালা-হাতে মৌলভী' ইত্যাদি।

৮) **শৈলেন্দ্রনাথ দে**—'বিরহী যক্ষ', 'কারাগারে-দেবকী' ইত্যাদি।

৯) **সুরেন্দ্রনাথ কর**—'দুইভগ্নী' ইত্যাদি।

১০) **ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্মণ**—'নর্তকী', ইণ্ডিয়া অফিসের ভিত্তি-চিত্রাবলী।

অবনীন্দ্র-শিষ্য বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার অংকিত : 'কুণালের চক্ষুলাভ'।

কান্নার গন্ধ

অমরেন্দ্র ঘোষ
বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় প্রতিভা-চিহ্নিত কথাসাহিত্যিক। 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'চরকাশেম', 'একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী' ইত্যাদি উপন্যাসের স্রষ্টা। 'কান্নার গন্ধ'—একটি অভিনব উজ্জ্বল কাহিনী।

হয়তো সংবাদটা আপনারা অনেকে পোড়েছেন আমিও পোড়েছি।

সেদিন ক্লান্ত এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা। ভাদ্দুরে জোলো মেঘ সারাদিন ধোরে গা ঝাড়ছে। জল আর জল। একটা লণ্ঠন জেদ্বলে উঠোনে বোসেছিলাম, একা। মাথার ওপর একটা টিনের চালা ছিল। তার চারদিক খোলা। লণ্ঠনটা ঝুলছিল একটা দড়ির সঙ্গে লোহার আংটায়। কখনো ঘুরছিল, কখনো বা দুলছিল ভিজে ঘূর্ণি হাওয়ায়।

নানাদিকে প্রতিফলিত হোচ্ছে আলো। দূরে নিকটে পুবে দক্ষিণে। অদ্ভুত এক বিভ্রান্তিতে যেন মনটা ভোরে গেল। কখনো দেখতে পেলাম পুঁই মাচার নিচে কে যেন কাঁদছে, কখনো ভিজে শিউলি ফুলের গন্ধে সে-ই যেন ফোঁফাচ্ছে।

চোখ মেলে পরিচয় কোরতে ব্যাকুল হোলাম। হায়রে লণ্ঠনটা কোরলে কিনা বেইমানি। অথচ তেল পলতে জুগিয়েছি আমি।

ঝির ঝির ঝির ঝির। কিছুক্ষণ বাদেই আবার তড়বড় কোরে ঝোরে গেল এক পশলা বৃষ্টি। চিকমিক কোরে উঠলো উঠোনের আঁকাবাঁকা বন্যার সোঁত। আবার শিউলি ফুলে কান্নার গন্ধ।

বন্যা থামলো। কিন্তু মন ভেসে চোলল।

হয়তো সংবাদটা আপনারা পোড়েছেন, আমিও পোড়েছি। ঠিক ঠিকানা জানিনে, তবু দুঃসাহসে বুক বেঁধেছি। যাবো কান্নার উৎস সন্ধানে, যে কান্নার গন্ধ করুণ, যে কান্নার বর্ণ নরম, স্ফটিক জলে প্রবাল ছোড়িয়ে দেখেছেন কি? যে-প্রবাল এক মুঠো শিউলির

মোত শাদা চিকমিক।

উপমা দিয়ে হয়তো বোঝাতে পারলাম না। হয়তো অক্ষমের হাতে পোড়ে আরো জটিল হোয়েছে অর্থ। তবু আমি কান্নার গন্ধ পেয়েছি। তাই আপনাকেও অনুরোধ জানাচ্ছি, চোলুন না, বেরিয়ে পোড়ি। আপনি যিনিই হোন না কেন, আপনার জীবনেও একটা ট্র্যাজেডি আছে, আছে কান্নার গন্ধ, কিছু বক্তব্য বালিশে জোড়িয়ে।

কখনো কি একা শুয়ে শুয়ে কাঁদেন নি? অস্বীকারে, অগৌরবে? অনেক দিয়ে, না পেয়ে?

তবে উৎস সন্ধানে আসুন। দেখবেন আমার, আপনার এবং যাকে নিয়ে এ-কথিকা তারও উৎস মুখ একই পাহাড়ে হিম ঝঞ্ঝার নিচে। শুধু একটু ভূগোল পালটাচ্ছে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে।

আসুন আমরাও ভূগোল পালটাই। এই বাঙলা দেশের কলোনীর ভান্দুরে পরিবেশ থেকে পাড়ি জমাই মোনের নায়ে। গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র-এর উৎস সন্ধান হোলেও কথা ছিল না। দাক্ষিণাত্যের কোনো বন্ধুর পার্বত্যখাত হোলে তো চিন্তাই কোরতাম না। যেতে হবে এই দ্বীপময় ভারতের ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে, যেখানে আল্‌পস পর্বত মালা ডানা মেলে রোয়েছে—থাক থাক বরফের ডানা। কল্পনা কোরুন ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার, পম্পাইর ধ্বংস। রোমের প্রাচীন সভ্যতা। এখনো ইটালি বহন কোরছে কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রের বিপুল ঐতিহ্য।

ঠিক ঠিকানাটা কি আপনার জানা নেই? সেই যে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল খবরটা।

ছায়া ছায়া অস্পষ্টই বটে। কিন্তু আমার যেন স্পষ্ট মোনে পড়ে সমুদ্রকটিতটে ইটালির কথা। বার বার নীলাম্বরী সোরে গিয়ে দেখা যাচ্ছিল ফেনার ঝালর।

সঙ্গীতে শিল্পে একদিন প্রধান ছিল রোমক সভ্যতা। এ-কাহিনী এক চিত্র-শিল্পীর। সে মেয়ে কি পুরুষ জানিনে। ছোপ ছোপ সংবাদ, এলোমেলো তথ্য। অনেক রং চাপিয়ে ভাবছি তত্ত্বটাকে ফুটিয়ে তুলবো।

একজন গাইড দরকার। ঐ তো একটি মেয়ে জলপাই গাছের আলো ছায়ায় দাঁড়িয়ে। পরণে হালকা পশমী স্কার্ট, মাথায় পালকের টুপি। ঠোঁট দুখানা ভিজে চকোলেটের মতো, লাল।

গুড মর্নিং ম্যাডাম। আমরা নবাগত, বোলতে পারেন একজন গাইড কোথায় পাবো?

আপনারা কি এখানকার বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী দেখবেন? এটা হোচ্ছে জগৎবরেণ্য কবি দান্তে চিত্র-শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর জন্মভূমি। মহান গ্যালিলিও এখানে জন্মেছেন। মেয়েটি গলা নামিয়ে বোললে, আর জন্মেছি এক অখ্যাত অবজ্ঞাত আমি। আসুন কতো কাল যে আপনাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েছি।

চোমকে আমরা মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটি নিজেকে আরো ব্যঙ্গ কোরে হাসলে, হাসালে। চমৎকার রসিকা গাইড। সময়টা কাটবে স্ফূর্তিতে।

না-শীত, না-গ্রীষ্ম। সমুদ্রের পাড় ধোরে হেঁটে চোলেছি। দূরে দেখা যাচ্ছে পাতলা কুয়াশা মাখা দুরাশার মোত পাহাড়। পাইন-ওক-ঝর্ণা। সমুদ্রের লোনা জলে নানাশ্রেণীর ছোট বড় মাস্তুল, ভাসমান ডক। নিকটে বন্দর, সমুখে পোতাশ্রয়। উঁচু উঁচু চিম্নি।

আমাদের লক্ষ্য বন্দর নয়, ঐ যে অতি প্রাচীন এক স্থাপত্যের নিদর্শন, মোটা মোটা আকাশ ছোঁয়া পাথরের থাম, ঐটাই কি আর্ট গ্যালারী?

গাইড বোললে, হ্যাঁ ভিতরে চোলুন।

আমরা অনেকক্ষণ ধোরে সিঁড়ি ভাঙলাম। চেয়ে চেয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত ভাস্কর্য। ফটকের সুমুখেই এক গ্রীক বীর, হাতে জ্বলন্ত মশাল। সেকালের আগুন যেন একালের ইতিহাস হোয়ে রোয়েছে ব্রোঞ্জে পাথরে।

মেয়েটি চকোলেট রঙা ঠোঁট দুখানা নাড়িয়ে বোললে, আসুন এই বীরের সঙ্গে পরিচয় কোরিয়ে দিই।

আমরা মার্বেল চত্বরে দাঁড়িয়ে পোড়লাম।

ইনি হোচ্ছেন আমার স্বামী।

বলেন কি?

আলেকজান্ডারের বিশ্ববিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে ইনি ছিলেন পুরোধা মশালচি। নিশ্চয় ইতিহাস পোড়েছেন, তখন ছিল গ্রীকদের শৌর্য বীর্যের যুগ। এঁরা মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হিন্দুকুশের ওপর ঝাঁপিয়ে পোড়েছিলেন।

কাজটা কি খুব ভালো কোরেছিলেন?

নিশ্চয়ই নয়। অন্তত আজকের দিনে তা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু গ্রীক এবং হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গম হোল। উনি মৃত্যুকালে বোলে গেলেন, বারবার জন্মান্তরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বিগত জীবন-গুলোর আর ফিরিস্তি টানবো না, হয়তো উনি যখন নাবিক ছিলেন আমি জেলের মেয়ে, উনি যখন চাষী, আমি আপেল তুলি। কিন্তু এ-জীবনে এখনো কুমারী। আজ কোথায় তুমি বিলাভেড?

গাইড একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

আমরা হাসলাম। বোললাম, শীগগিরই দেখা হবে। কি বা বয়েস আপনার, অতো মুষড়ে পোড়বেন না এর মধ্যে।

ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান উপদেশের জন্য। গাইড হাসলে যেন মুক্তার ঝাঁপি খুলে।

এবার ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের সঙ্গে রোয়েছে নানাদেশের টুরিষ্ট—আরব এক রাজ পরিবার, ইংরেজ বণিক দম্পতী, দুটি চীনা যুবতী। একটু এগিয়ে গেলেন তুরস্কের ছাত্র, মধ্য এশিয়ার নর্তকী কজনে। অনেককে চিনলাম, অনেককে চিনলাম না, যদিও গাইডের মুখে খৈ ফুটছে। রকমারী সজ্জা, কথা বলার বিশেষ বিশেষ ধরণ, শুধু একটা জায়গায় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মিল—সকলের চোখেই অতলান্ত বিস্ময়।

প্রকান্ড হল। ভিতরে ঢুকলেই মনে হয়, এই যে আঁধার, এ বুঝি বা আলোর অধিক। থামে দেয়ালে কার্নিসে অশেষ কারুকর্ম। এত ফিরিস্তি জানা নেই।

গাইড বুঝিয়ে যাচ্ছে আমরা কিছু বুঝব বোলে মনে হোচ্ছে না।

শুধু অবাক হোয়ে দেখছি আর দেখছি। কোথাও বা মোটা কাঠের অপূর্ব ফ্রেমে আঙুরলতার নকসা। ভিতরে একখানা মহার্ঘ বর্ণাঢ্য সান্ধ্য গোধূলির ছবি। কোথাও বা সোনার ফ্রেমে মুক্তার কাজ, ভিতরে অতুলনীয় মাতৃ-মূর্তি—ম্যাডোনা। দেখতে পেলাম উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীর কাম-কান্তি। ছবির পর ছবি। রোয়েছে নম্রতার অবতার যিশুর দেব-দুর্লভ তৈল-চিত্র।

এবার একটু বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছে গাইডের ঘোষণা। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হোয়ে গেছে, তবু বর্ণ-সুষমা এতটুকুও ম্লান হয়নি কোনো একখানা ছবির, কারণ এগুলো হোচ্ছে বিশ্ব-বরেণ্য চিত্রশিল্পীদের অমর অবদান। যুগ যুগ ধোরে এমনি অম্লান রোয়েছে এবং থাকবে।

গাইড মেয়েটি আবার একটু মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল, আবার একটু থেমে বোলতে সুরু কোরলে, আপনারা ইন্ডিয়ান, আপনারা নিশ্চয় অজন্তা গুহা-চিত্র দেখেছেন, সেই প্রাণবন্ত ছবিগুলো আঁকতে কি কি রং কিভাবে যে মিশিয়ে ব্যবহার করা হোয়েছিল, আজো যেমন বিজ্ঞানের কাছে জানা নেই, এ-গুলের বেলাও সে কথা সমান প্রযোজ্য। এখানকার প্রতিটি ছবিতে রোয়েছে কালজয়ী স্পর্শ।

আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা এগিয়ে যেতে লাগলাম। দেখলাম রঙের যাদু, বর্ণের সমারোহ, ভাবের অপূর্ব দ্যোতনা। যুগ-যুগান্ত চেয়ে থাকলেও বুঝি এ-ছবি-গুলোর আবেদন বিরস হবে না। এতো মুগ্ধ হোয়ে চোলেছি যে গাইড মেয়েটির কোন বর্ণনাই আর কানে এলো না। শুধু অতীতে তলিয়ে হাঁটছি, মুহূর্তে

তোলিয়ে ভাবছি, মানুষের ঐতিহ্য তোলিয়ে দেশ-কালের সীমা ভুলে গেছি। বুঝি বা ভুলে গেছি হিংসা, দ্বেষ, জাতিতে গোষ্ঠীতে ব্যবধান।

এই কি অমরলোকের স্বাদ?

গাইড মেয়েটি থামলে। এবার রীতিমত গলায় আবেগ মিশিয়ে বোললে, ঐ ত্রিকোণ হলটিতে শেষ ছবিখানা রোয়েছে, এবং বিশেষ ছবি একটি। তারপর হে বন্ধু বিদায়। বেশ একটু করুণ হোয়ে উঠলো মেয়েটির গলা। আমার কেনই যেন মোনে পোড়লো এই মেয়েটির প্রথম সম্ভাষণের কাহিনী, মহান গ্যালিলিও এখানে জোন্মেছেন, আর জোন্মেছি এক অখ্যাত অবজ্ঞাত আমি।

মুহূর্তে মুগ্ধতা কেটে গেল। আবার কানে আসতে লাগলো গাইডের বর্ণনা। প্রায় দেড়শো বছর ধোরে ওই হল ঘরে একখানা ছবি আছে, যার মধুর স্মৃতি কোনো পর্যটক কখনো বিস্মৃত হোতে পারেন না। দেশে ফিরে গিয়েও সারা জীবন ধোরে রোমন্থন করেন মাধুর্য। আমি জানি আপনারাও কোরবেন। আমাকে ভুলে যাবেন, কিন্তু শেষ ছবিখানাকে কিছুতেই ভুলতে পারবেন না। এ এক আশ্চর্য শিল্প-প্রতিভা। এ এক আশ্চর্য রং রেখার খেলা, এ এক স্মরণীয়—।

হঠাৎ গাইডের কণ্ঠ স্তব্ধ হোল। যেন দমকা হাওয়ায় নিবে গেল দীপ। কী যেন এক মহৎ বেদনায় তার চোখে দুফোঁটা জল নেমে এলো।

আমরা দাঁড়িয়ে পোড়লাম ত্রিকোণ হলের সুমুখে। এখানকার অধ্যক্ষ ঘোষণা কোরলেন, প্রায় দেড়শো বছর বাদে ধরা পোড়েছে এক অতি লোভীর দুষ্কর্ম। সে তার কলঙ্ক এক বরেণ্য গুণীজনের নামে চালু কোরে দিয়ে গেছে গোপনে। এতো কাল বাদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সে-জালিয়াতি ধরা পোড়েছে। গুণীর হাতের রেখা রং প্রযুক্তি বিন্যাসের সঙ্গে কোন মিল নেই এই জাল ছবির। আজ এখনই এ-কলঙ্ক মহতের ভীড় থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

হোক কলঙ্ক, হোক এক অখ্যাতের আকূতি—যে ছবি এতো কাল ধোরে প্রত্যেককে মুগ্ধ কোরেছে তা দেখার জন্য ব্যাকুল হোলাম। শেষ ছবিখানা কোথায়?

কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। ছবিখানা কালো কাপড়ে মোড়া, যেন কফিনে ঢাকা হোয়েছে শব।

গাইড, গাইড কোথায়?

রহস্যময়ী অদৃশ্য হোয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম বৃষ্টি আর বৃষ্টি। চারদিক কান্নার কোরুণ গন্ধে ঝাপসা। বহু পর্যটকের ভিড়ে সেই মেয়েটিই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে—সেই অখ্যাত অবজ্ঞাত অতিলোভী আমি। ঐ কঙ্কিনের শব কি তারই কোনো এক বিগত জীবনের রং তুলি রেখার কলঙ্ক?

শিল্পী পল ন্যাস—তাঁর নিজের স্টুডিওতে।

শিল্পী পল ন্যাস

অংশুরঞ্জন সেন

শিল্পীর শক্তিমত্তা ফুটে ওঠে তাঁর তুলিতে। তাঁর সৃজন-ধর্মী মনে জেগে ওঠে একটা অন্বেষণের আগ্রহ, অসীম ব্যাকুলতা। সেই দৃষ্টি-কৌতূহলী মন নিয়ে তিনি কোন দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিচ্ছবি জীবন্তরূপে চিহ্নিত কোরে তোলেন রং ও রেখার সার্থক সমন্বয়ে। তাঁর আন্তর প্রেরণাই তাঁকে কোন বিষয়বস্তুর অন্তর্লোকে প্রবেশ করার পথ কোরে দেয়। সেখানে ঢুকে তিনি আবিষ্কার করেন তার মূল সুরটি। তখন একান্ত নিজের মতো কোরে তাকে তিনি ভাবেন, আর ভেবে নিজের মতো

সাহিত্য ও শিল্প-সম্পর্কিত প্রবন্ধে অংশুরঞ্জন সেন সিদ্ধহস্ত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বসুমতী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসাবে পরিচিত।

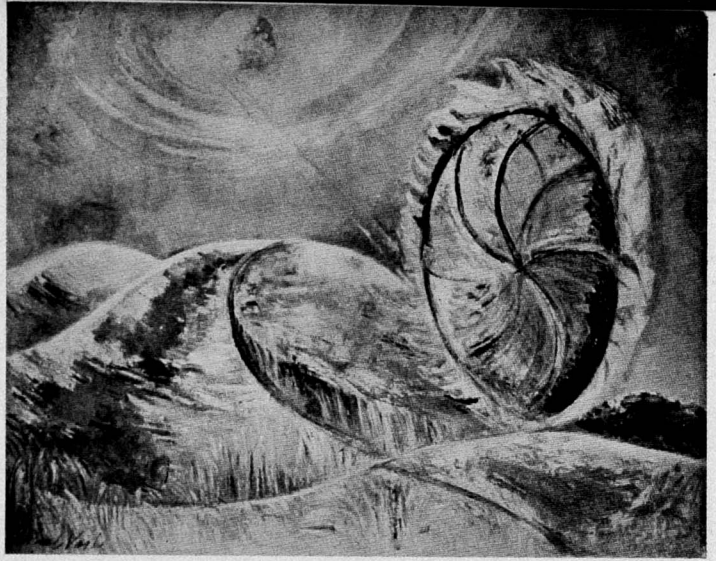

শিল্পী পল ন্যাস অঙ্কিত সূর্যমুখী
ফুলের একটি বিচিত্র রূপরেখা।

কোরে আঁকেন তাকে। এভাবে ধীরে ধীরে ধরা পড়ে সেই বস্তুটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তার একান্ত সত্তা। শিল্পীর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি আর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে এখানেই, আর তার ওপরই নির্ভর করে তিনি কত বড় স্রষ্টা তার বিচার। আর এমনিতর একজন শিল্পী হোলেন পল ন্যাস্।

লণ্ডনের আর্লস্ কোর্ট অঞ্চলে পল ন্যাসের জন্ম আঠারশো উননব্বই সনে। স্থানীয় আইনজ্ঞ ও পরে এবিংগ্‌টনের 'বরো' শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত উইলিয়াম্ হ্যারী ন্যাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পল আর তাঁর ভাই জন ন্যাস্ কিশোর বয়সে একসঙ্গে শিল্পচর্চা কোরতেন। পলের স্কুলজীবন কেটেছিলো একটা নিষ্প্রাণ জটিল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম কোরে। সেণ্ট্ পলস্ স্কুলে তিনি পড়তেন। এই স্কুলকে তিনি একটা প্রেতলোক বোলে বর্ণনা কোরেছেন। অবশ্য স্কুলে তিনি কাটিয়েছিলেন মাত্র তিন বছর। কিন্তু এই তিন বছর তাঁর কাছে পণ্ডশ্রম মাত্র, কারণ বিদ্যালয়ের ঐ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কিছুই শেখেন নি তিনি। তাই তিনি বোলেছেন, 'আমার শিক্ষা শুরু হোল তখনই যখন নিজের মতো কোরে আমি শেখবার জানবার স্বাধীনতা পেলুম।' এই স্বাধীনতাকে তিনি ভালো কাজেই লাগিয়েছিলেন। তাঁর সংকল্পপূর্ণ আর কৌতূহলী মন শিল্পরীতির এক বিস্তৃত জগৎকে আপনার মধ্যে টেনে এনে তার সব মালমসলা গ্রহণ কোরেই ক্ষান্ত হয়নি, নানা বুদ্ধিজীবী মহলেও তা' স্বচ্ছন্দে আনাগোনার শক্তি অর্জন কোরেছিলো।

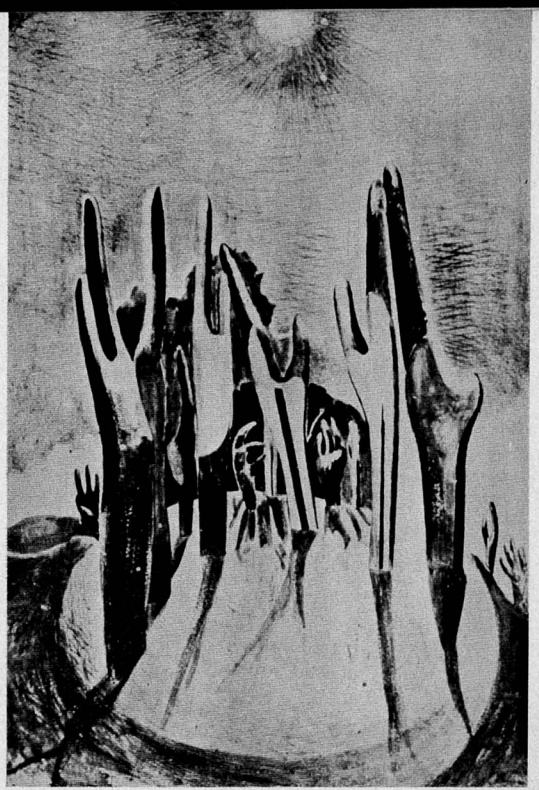

শিল্পী পল ন্যাস অঙ্কিত :
'সূর্যোদয়'।

এর পরেও তাঁর বাবা তাঁকে শিল্পজগৎ থেকে সরিয়ে এনে অন্যদিকে মানুষ কোরে তোলার চেষ্টা কোরেছিলেন, কিন্তু পলের শিল্পীমন তা'তে সাড়া দেয়নি। তাই নৌবিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হোলেন আর স্থাপত্য ও ব্যাঙ্কিং-এর মতো সম্মানজনক কাজেও তিনি টিঁকে থাকতে পারলেন না প্রাথমিক গণিতের ওপর তাঁর জ্ঞানের অভাবে। তারপর জীবিকাঅর্জনের জন্যে একজন চিত্রকর হিসেবেই শুরু হোল তাঁর কাজ। অবশ্য এতেও তিনি পেয়েছিলেন বাবার আশীর্বাদ। কিন্তু তার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার কোরতে হোয়েছিলো। বোল্ট কোর্টের লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল টেকনিক্যাল্ স্কুলে কখনো সাফল্য কখনো ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে একদিন তাঁর স্বপ্ন সফল হোল, কিন্তু এই কাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তখনো এক অস্পষ্টতায় আবৃত। তারপর উনিশশো নয় সনে যখন ওয়ালিংফোর্ডে তিনি বেড়াতে গেলেন তাঁর কাকার কাছে তখন সেখানে তাঁর চোখে পড়লো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের একটা ব্যতিক্রম। সেই জায়গায় তিনি প্রথম

দেখলেন যমজ সন্তানের মতোই প্রতিভাত এক স্মরণীয় কুঞ্জবন-পরিবেষ্টিত সুসদৃশ পর্বতমালা আর উইটেন-হামের বৃক্ষশ্রেণী, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে যেন কোন শক্তির দ্বারা বশীভূত এক মূর্তির প্রতিচ্ছবি হোয়ে দেখা দিতো বারবার। তারা যে তাঁর মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত কোরেছিলো তা তিনি স্বীকার কোরেছেন। তিনি বোলেছেন, 'তারা হোল আমার ছোট্ট জগতের পিরামিড্।'

ছোট বয়স থেকেই পল ন্যাস্ যা কিছু অদ্ভুত, আশ্চর্য, তার প্রতি প্রবলভাবে সাড়া দিয়ে এসেছেন আর তাঁর দেখা ও শোনা সমস্ত আকৃতি ও শব্দকে অতিরঞ্জিত কোরে তুলতেন। তাঁর স্বরচিত অসমাপ্ত স্মরণালেখ্য থেকে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তার দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ছোটবেলার দূর থেকে ভেসে-আসা কোন শব্দকে তিনি মনে কোরতেন ক্রুদ্ধ গর্জন কিংবা কাদের সংঘর্ষ, কিন্তু কাছে এলে দেখা যেতো তা' দু'টি বিবাদকারী মানুষের কোলাহল মাত্র। আবার অন্ধকার রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি চিলেকোঠা থেকে কাদের ধুপধাপ শব্দ আর একটা অস্পষ্ট বাদ্যধ্বনি শুনে ভীত হোয়ে পড়তেন। কিন্তু আসলে তা' ছিলো ধেড়ে ইঁদুর-গুলোর লাফালাফির শব্দ আর তাদের শিঙার মতো ডাক। আর অনেক বছর পরেও এমনি কোরেই তিনি নানা বিচিত্র কথা শুনে আর অদ্ভুত আকৃতি দেখে অভিভূত হোয়ে পড়তেন। তাই তখনো তাঁর উদ্ভাসিত দৃষ্টির স্বর্গীয় আলোকে মানুষ, প্রাণী সব কিছুকেই অন্ধকারবর্তী বিচিত্র অদ্ভুত জীব বোলে মনে হোত। এটাই দীর্ঘকাল ধরে একটা সংশয়জনিত ব্যাকুলতার ভাব জাগিয়ে রাখলো তাঁর মনে যা' তাঁর শিল্পসৃষ্টির পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ হোয়েছিলো।

কিন্তু শিল্পীজীবনের প্রারম্ভে তাঁর মনে ঐসব অদ্ভুত কিংবা অশুভ লক্ষণগুলোর সঙ্গে রোমান্টিক ভাবের প্রাধান্যও দেখা গিয়েছিলো বেশীরকম। বিশেষ কোরে বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী ডি, জি, রোসেত্তির জাদুস্পর্শেই হোয়েছিলো তাঁর এই পরিণতি। অবশ্য পরে রোসেত্তির অঙ্কনপদ্ধতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন বোলে মন্তব্য কোরেছেন। এ ছাড়া তিনি কবি টেনিসন্, মরিস্, কীটস্, হুইট্ম্যান্, ব্লেক্ আর কোলরিজ্ সকলের লেখাই পড়েছেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত অর্থ আবিষ্কার কোরতে গিয়ে তিনি নতুন কোরে আঘাত খেয়েছেন আর তাঁর চিন্তাধারা গেছে ওলটপালট হোয়ে। শুধু একমাত্র রোসেত্তির সম্বন্ধে লেখা সবকিছুই তিনি পড়েছেন, আর রোসেত্তির নিজের লেখা কবিতা ও আঁকা ছবিগুলোর মূল বিষয় সম্পূর্ণরূপেই তিনি আয়ত্ত কোরেছিলেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় রোসেত্তি হবার কল্পনা কোরেছিলেন, যাঁর প্রভাবে তিনি কিছুকাল ধরে কবিতা লেখাও শুরু কোরেছিলেন। উনিশশো বারো সনে রোসেত্তি-প্রভাবিত এই যুবকের 'দি ক্রাইয়ার্ বাই নাইট' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হোল। এতে বর্ণিত চরিত্রের চেহারার সঙ্গে রোসেত্তির বিখ্যাত ছবি বেটা বিয়েত্রিসের ম্লান, ভাব-গদগদ মুখটির একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর অন্তস্তল থেকে সরে গেলো রোসেত্তির মূর্তি আর সেই স্থান দখল কোরলেন চিত্রকর ও কবি ব্লেক্। পল ন্যাস্ তাঁর সুপ্রখর কল্পনাশক্তি ও প্রবল অন্তরাবেগের জন্যে নিঃসন্দেহে রোসেত্তির কাছে ঋণী বটে, কিন্তু পল ন্যাসের প্রায় বেশীরভাগ চিত্রাঙ্কনের বিষয় অর্থাৎ অশরীরী ও অচেতন বস্তু রূপায়ণের ব্যাপারে রোসেত্তি তাঁকে তেমন-ভাবে প্রভাবিত কোরতে পারেন নি।

শিল্প-সম্বন্ধে আরো উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে পল ন্যাস্ ভর্তি হোয়েছিলেন লণ্ডনের বিখ্যাত স্লেড্ আর্ট স্কুলে। এই শিল্প শিক্ষায়তনকে কেউ বোলেছেন বোহেমিয় জীবনযাত্রার উৎস, আবার কারুর মতে স্বাধীনতা, আমোদ-প্রবণতা আর খামখেয়ালীপনার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু পল ন্যাসের দৃষ্টিতে সেণ্ট পলস্ আর স্লেড্ দুই-ই এক। তাঁর সময়ে স্লেডে যেসব প্রতিভাবান শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিলো তা'তে ছিলেন স্টানলী স্পেন্সার, মার্ক গার্টলার, উইলিয়াম রবার্টস্, এডওয়ার্ড্ ওয়াডস্ওয়ার্থ আর নেভিন্সন্ প্রমুখ শিল্পীরা, আর এঁরা সকলেই ছিলেন পলের ছাত্র-বন্ধু। স্লেডে তিনি ক্রমশঃ বেশীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হোয়ে পড়লেন।

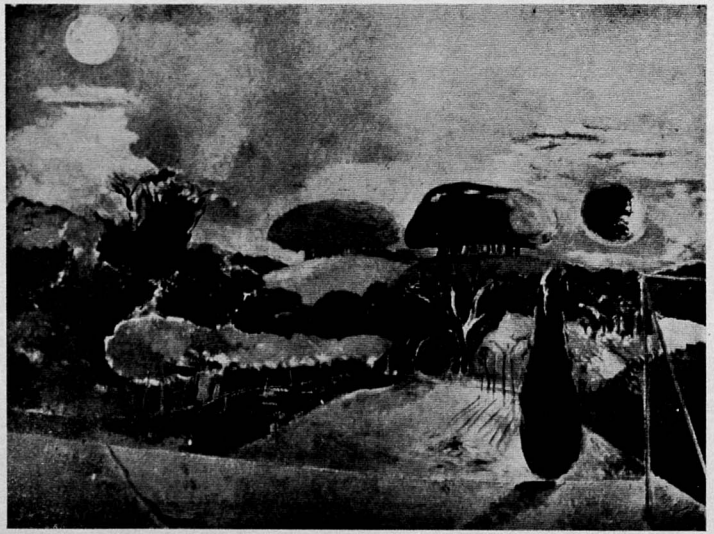

শিল্পী পল ন্যাস অঙ্কিত
একটি প্রতীক ধর্মী চিত্রের প্রতিলিপি।

শিল্পী পল ন্যাস অঙ্কিত : 'প্রেরণাদাত্রী দেবী'।

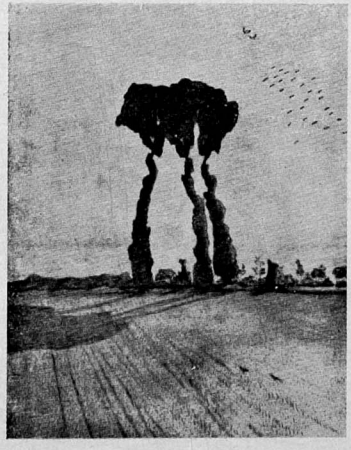

শিল্পী পল ন্যাস অঙ্কিত : 'ত্রয়ী'।

কিন্তু তবুও কিছুকাল ধরে তিনি প্রকৃতিবিষয়ক চিত্র বা 'ল্যান্ডস্কেপ' আঁকার জন্যে কোন উপায় খুঁজে পান নি। উনিশশো এগার সনে তাঁর 'স্প্রিং এ্যাট্ দি হকস্ উড্' নিসর্গচিত্রটিতে তার স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতাই স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। আবার একই বছরে 'দি বার্ড গার্ডেন্' নামে আরো একটি নিসর্গচিত্র আঁকেন তিনি। যদিও এই ছবিতে তেমন স্পষ্টভাবে কোন ফর্ম বা রূপ ধরা দেয়নি, তবুও এতে একটা বিশেষ ছন্দের আভাষ পাওয়া যায় যার ফলে একে আগের ছবির তুলনায় অনেকটা জীবন্ত মনে হয়।

যদিও এই সময়ে পল ন্যাস্ নিসর্গচিত্র আঁকার ব্যাপারে তেমন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর কয়েকটি ছবি, যেমন 'পিরামিডস্ ইন্ দি সন' (১৯১২), 'ফলিং স্টারস্' (১৯১১) ইত্যাদি শুধু ভাব-প্রকাশের মধ্য দিয়েই অনবদ্য হোয়ে ওঠে নি, আশ্চর্য-রকমের হৃদয়গ্রাহীও বটে। তাঁর স্লেড্ স্কুল ত্যাগ আর প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের মধ্যেকার এই কয়েক বছরে তাঁর চিত্রকর্ম স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। এই ফর্মের সঙ্গে তাঁর গোড়ার দিককার আর এর পরে অনুসৃত শিল্পরীতির বৈসাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট হোয়ে ধরা দিয়েছে। এই সময়ে তাঁর জল-রঙে আঁকা ছবিগুলো উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই ব্যাপারে তিনি সাবেক কালের রীতিকে যদিও একেবারে ছাড়তে পারেন নি, তবুও এর পরম্পরাগত পদ্ধতিগুলিকে একটা স্বতন্ত্র ও সমসাময়িক রূপে উদ্ঘাটিত কোরে তোলার চেষ্টা কোরেছেন। তাঁর নির্বাচিত বিষয় হোল ইংলণ্ডের নিসর্গচিত্র। এতে তিনি ঐদেশের সুন্দর নগরোদ্যানের মতো দৃশ্যাংকনের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। এভাবে তিনি সেই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গ অর্থাৎ সবুজ তৃণভূমি, নানা আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের সারি ও জমাই জমি, আর জটিলতায় ভরা ঘন উচ্চ এলম্ গাছগুলির নয়ন-রঞ্জক দৃশ্যাবলী তাঁর দূরবিসারী কল্পনা আর শান্ত প্রসন্ন কবিদৃষ্টির মাধ্যমে মূর্ত কোরে তুলেছেন চিত্র-গুলিতে। কল্পনা ও গীতিময়তার এই অনুপম চিত্রাবলীর গঠনসৌষম্য আর জল রঙের উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ প্রলেপের মধ্যে তিনি একটা মৌলিক সুর ধ্বনিত কোরে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'দি থ্রী' নামে একটি নিসর্গ চিত্র উল্লেখযোগ্য। এটা হোল অসংশ্লিষ্ট গাছগুলির একটা সুন্দর চিত্ররূপ। সমসাময়িক অন্যান্য ছবিগুলির চাইতে এতেই যেন কবি-হৃদয়ের ভাব সংক্রামিত হোয়েছে খুব গভীরভাবে। কিন্তু এ ছাড়া তাঁর আরো কতকগুলো ছবি রোয়েছে যাদের শিল্পরীতির আঙ্গিকগত ত্রুটি সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে অভিজ্ঞ দর্শকের সতর্ক চোখে। তরঙ্গিত মেঘ, ঢেউ, গাছ-গাছড়া প্রভৃতিকে নিয়ে আঁকা তাঁর এ ধরণের ছবিগুলো তাদের প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছে বস্তু-সর্বস্বতা বা বস্তু-সৌসাদৃশ্যের বাহুল্যে। আবার তাঁর জোরালো রঙে আঁকা কয়েকটা ছবিতে স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে চিত্রাঙ্কনগত শৃঙ্খলা ও সংযমের অভাব। উনিশশো চৌদ্দ সনে আঁকা তাঁর 'ল্যান্ডস্কেপ এ্যাট্ উড্ লেন্' নামে একটা সাধারণ ছবিই হোল তার প্রমাণ।

কিন্তু ঐ একই সময়ে তাঁর জীবনে এলো একটা পরিবর্তন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হোয়ে উঠলো আরো সজাগ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন তাঁর জীবন ও শিল্পের এই অধ্যায়কে দ্রুত মুছে দিলো। উনিশশো চৌদ্দ সনের

শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত স্বীয় ব্যঙ্গ চিত্র।

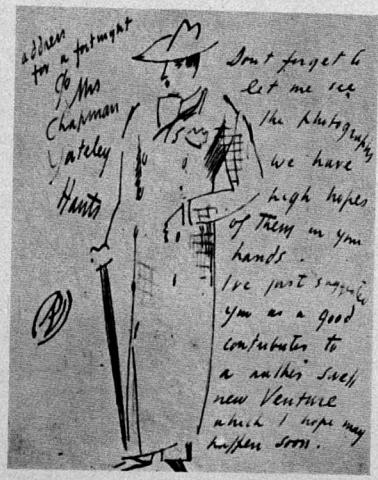

আগষ্ট মাসে তিনি 'আর্টিস্টস্ রাইফেলস্'-এ একজন সামান্য সৈনিক ও সরকারী চিত্রকর হিসেবে যোগদান কোরলেন। সেই বছরেই তিনি রেভারেণ্ড এন, ওদে-র মেয়ে মার্গারেটকে বিয়ে করেন। উনিশশো ষোল সনে তিনি তৃতীয় হ্যাম্পশায়ার রেজিমেণ্টের সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট পদে উন্নীত হোয়ে বিদেশে চলে যান আর বেলজিয়ামের ইপার সেলিয়েণ্ট সহর হোল তাঁর কর্মস্থল। আর এই জায়গাটি প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিম ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তারপর উনিশশো সতের সনে তিনি চলে আসেন একেবারে ফ্রণ্ট লাইনে। এই বিরাট মারণ-যজ্ঞের মধ্যে তিনি জীবনকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি কোরলেন। আর যে অভিজ্ঞতা অধিকাংশ মানুষ তাদের নির্দিষ্ট আয়ুর পূর্ণ মেয়াদেও সঞ্চয় কোরতে পারে না, তিনি ঐটুকু সময়ে তা' লাভ কোরেছিলেন তাদের চাইতেও বেশীমাত্রায়। যুদ্ধের সেই ভয়ংকর রূপ, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু-বেদনা তাঁর প্রাণে স্পন্দিত হোল। ভারী বোমার বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত সহর, বাড়ী-ঘর, স্কুল, চার্চ আর গৃহহীন আশ্রয়হীন উদ্বাস্তুর হাহাকার তাঁর মনকে অভিভূত কোরেছিলো। যুদ্ধের রঙ্গশালয়ের এই দৃশ্য অচিরেই তাঁর শিল্পরীতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটালো। শিল্পরীতির সমস্যাগুলো সম্পর্কে তিনি তেমন সচেতন ছিলেন না, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর পূর্বজ্ঞান ও দখল তাঁকে সাহায্য কোরেছিলো যুদ্ধের চারাদিকব্যাপী সেই বিরাট ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা থেকে চিত্রাংকনের উপযোগী যথার্থ উপাদানগুলো সহজেই বেছে নিতে। তাই এ সময়ে তাঁর আঁকা ছবিগুলো মানুষের মনের গভীরে লেখার দাগ-এর চেয়েও গভীরতর রেখা রেখে যায়। এভাবে সেই অকল্পনীয় বিভীষিকার মধ্য থেকে তিনি ধীরে ধীরে বার কোরলেন এক নতুন ছন্দ, আর তা'তে সঞ্চার কোরলেন নতুন প্রাণ। তাঁর যুদ্ধের সবচাইতে ভালো স্টাডিগুলোর কোনো কোনোটা প্যাস্টেল, জল-রং, কালী আর খড়িমাটীর সাহায্যে, আবার কোনটা তাদের একত্র সমন্বয়ে আঁকা হোয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'ক্যানাডিয়ান্ ওয়ার্ মেমোরিয়াল্' (১৯১৮), 'সানরাইজ্ ইনভারনেস্ কোপস্' (১৯১৮), 'মেডো উইথ কোপস্ টাওয়ার্ হ্যামলেটস্ ডিস্ট্রীক্ট' (১৯১৮), 'দি মেনিন্ রোড' (১৯১৮) প্রভৃতি বিখ্যাত ছবিগুলোর নাম করা

শিল্পী পল ন্যাসের ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন শিল্পী-পত্নী মার্গারেট ন্যাস।

যেতে পারে। তাঁর স্মৃতির পাত্রে, সঞ্চিত অথবা মনের গহনে সুপ্ত ভাবধারাগুলি উদ্দামতার পরিবর্তে যেন এক শান্ত হৃদয়ের স্নিগ্ধ নির্লেপে এই বিস্ময়কর চিত্র-গুলিতে রূপায়িত হোয়ে উঠেছে। তারা হোল আধুনিক কালের কাল্পনিক সৃষ্টির কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ।

তাঁর মতো তীক্ষ্ণ বোধশক্তিসম্পন্ন, সাফল্যলাভে দৃঢ়, আর নিতান্তন গৌরবে ভূষিত শিল্পীর পক্ষে যুদ্ধের পরে শান্তিপূর্ণ অবস্থার সময়ও নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে কোন গুরুতর বাধার সম্মুখীন হোতে হয়নি। তিনি এবার নতুন ধরণের কাজে হাত দিলেন, যেমন—কাঠ খোদাই-এর কাজ, বয়ন-নক্সা, আর শিল্পসম্বন্ধীয় রচনা। কিন্তু উনিশশো একুশ সনে তিনি এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে এই কাজগুলো আর

এগুতে পারলো না। আরোগ্যলাভের জন্যে তিনি দক্ষিণ ইংলণ্ডের সমুদ্রোপকূলবর্তী ডোরসেট্ জেলার ডাইম্-চার্চ নামে একটা জায়গায় গেলেন। সমুদ্রোপকূলের এই বিস্তৃত স্থান দর্শনের ফলে তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হোল তা তাঁর জল ও তেল রঙে আঁকা ছবির একটা সম্পূর্ণ ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলো। এই ছবি-গুলিতে সমুদ্রতটের ওপর ঢেউগুলির ছন্দিত স্পন্দন আর সমুদ্র ও আকাশের অনন্ত বিস্তারকে মূর্ত কোরে তোলার মধ্যে যে প্রাণময়তা ও ছন্দ-সহজ গতিশীলতার নিদর্শন পাই তা' এককথায় অসাধারণ। উদাহরণত, তাঁর জল রঙে আঁকা 'ডাইম্ চার্চ স্ট্র্যাণ্ড', 'উইণ্ড হিল' প্রভৃতি আর তেল রঙে আঁকা 'কোস্ট সীন্', 'বার্কশায়ার্ ডাউনস্' প্রভৃতি ছবিগুলো একটা বিশাল স্থানের দৃশ্যাবলীকে নিসর্গচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা, নিখুঁত ডিটেলস্-জ্ঞান ও বাস্তববোধের সাক্ষ্য দেয়।

ডাইম্ চার্চ থেকে তিনি প্যারিসে গেলেন দুতিন হপ্তার জন্যে। সেখানে সমসাময়িক ফরাসী শিল্পের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারার মোড় গেলো ঘুরে। শিল্পে 'ফাঁবিজম্', 'কিউবিজম্' আর অন্যান্য পদ্ধতি-গুলি প্রবর্তনের জন্যে যে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ঢেউ প্যারিস্ থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিলো তা' ছিলো সর্ব-ব্যাপক, কারণ সবরকম শিল্পীই অর্থাৎ যাঁরা এ ব্যাপারে অবগত নন আর অপরদিকে যাঁরা সম্পূর্ণ-রূপেই তাদের জানতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই ভাবান্তরিত হোয়েছিলেন তাদের প্রভাবে। পল ন্যাসের সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে তাঁর চেতনার ওপর যেসব ভাবধারা রেখাপাত কোরতো তাদের প্রতি তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। ফ্রান্সে ফরাসী শিল্পীদের সান্নিধ্যে এসে আর সমসাময়িক ফরাসী চিত্র-প্রদর্শনীগুলো দেখে তাঁর মন হোল আলোড়িত। এভাবে তাঁর নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির পক্ষে ঘটলো ব্যাঘাত। ফরাসী শিল্পী আর তাঁদের চিত্রাবলীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি উপলব্ধি কোরলেন একটা বিরাট ঐতিহ্যের অস্তিত্ব, যা' তাঁকে আকর্ষণ ও উপেক্ষা দুই-ই কোরলো। মানুষ ও শিল্পী হিসেবে তাঁর মনটা ছিলো খুব বেশীরকম খুঁতখুঁতে। শিল্পজগতে যা নেই কিংবা যা কখনো হবে না তাদের সম্বন্ধে বাস্তবিকই তন্ময় হোয়ে চিন্তা কোরেছেন তিনি। তাই সকলের কাছে এটাই স্বাভাবিক বোলে মনে হবে যে তিনি এক মহান ঐতিহ্যে লালিত হোয়েছেন। এমন কি ফরাসী চিত্রকলা দেখে যখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হোয়ে পড়েছেন তখনো তিনি তাঁর নিজের দেশের শিল্প-ঐতিহ্যের কথা এতটুকু বিস্মৃত হন নি। ইংরেজ জল রং-আঁকিয়ে ও কবিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অকুণ্ঠ প্রেরণা, প্রত্যাতনামা শিল্পী রোসেত্তি, বরো আর ব্লেকের প্রভাব, আর ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা ও নানা বিচিত্র ধ্বনি তাঁর মনে চিরস্থায়ী হোয়েছিলো। কিন্তু উনিশশো পঁচিশ থেকে তিরিশ-এর মধ্যে তাঁর শিল্পরীতির হোল পরি-বর্তন। তিনি পারীর শিল্পাঙ্কনের প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাকশানের প্রতি অনুরাগী হোয়ে উঠলেন গভীরভাবে। এই আকর্ষণের ফলে তাঁর অন্তর থেকে প্রকৃতির রূপের নিছক অনুকরণের প্রবৃত্তি বিদায় নিলো চিরতরে। সৌন্দর্য বস্তুগত নয়, একান্তই মনোগত, এ সত্যই তখন তাঁর প্রতিপাদ্য। এই নতুন সংজ্ঞা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী খুব ভালোভাবে পরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে তাঁর 'ফ্রেঞ্চ ফার্ম', 'ব্যাল্‌কনি', 'মিশোশা উড্' প্রভৃতি প্রাকৃতিক চিত্রাবলীতে।

আবার উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো উনচল্লিশ-এর মধ্যে ন্যাসের ব্যক্তিমন ও শিল্প-শৈলীর পরিবর্তন হোল সার টমাস্ ব্রাউনের দৈববাণীপূর্ণ অলৌকিক বিচিত্র রচনাগুলো পড়ে। তাঁর মধ্যে সুরিয়ালিষ্ট শিল্পীর লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলো, অর্থাৎ তাঁর অব-চেতনে সব জিনিষই স্বপ্ন-প্রসূত প্রতিরূপে মূর্ত হোয়ে উঠলো। এই প্রতিরূপগুলো তাঁর জীবন ও শিল্পাঙ্কন উভয়ের ভেতরেই প্রবেশ কোরলো। টমাস্ ব্রাউন ও সুরিয়ালিষ্ট শিল্পীদের প্রভাবে তাঁর চেতনা থেকে জন্ম নিলো যেন অতি নিকটে অবস্থিত বিস্ময়-কর এক স্বপ্নঘেরা পৃথিবী, যার মধ্যে অস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত চাঁদ, মাটির প্রাকার, ফসিল বা প্রস্তরীভূত অস্থি কিংবা কাঠ, বৃহদাকার প্রস্তর, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতির মতো রহস্যময় প্রতীকগুলো পরোক্ষে এক গূঢ়ার্থক ভাবধারাকেই প্রকাশ করে। এককথায়, তারা হোল পৃথিবীর রহস্যাবৃত শৈশবাবস্থায় সমস্ত ভৌতিক পদার্থের আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ, অর্থাৎ যে পৃথিবীতে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন অথবা আদিম

মানুষের বসতি ছিলো না। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে পল ন্যাস্ সুরিয়ালিজ্‌মের দ্বারা প্রভাবিত হোয়েছিলেন বটে, অথচ আসলে তিনি কখনো সুরিয়ালিষ্ট ছিলেন না। তাঁর কাছে এই সুরিয়ালিজমের অর্থ হোল হৃদয়ের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ চিন্তাধারা, কাব্যবোধ ও দূরবিসারী কল্পনার মুক্তি আর যার ফলে তিনি তখনকার অতি-নৈষ্ঠিক ও বাহ্যনিয়মপ্রিয়তায় শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে মুক্ত কোরেছিলেন।

বস্তুতঃ, পল ন্যাস্ তাঁর শিল্পজগৎ থেকে মানুষের দেহ চিত্রায়ণের বিষয়কে একেবারে বাদ দিয়েছিলেন, আর তার বদলে তাদের ব্যক্তিত্বকে গাছ-গাছড়া সমৃদ্ধ প্রকৃতি আর আকাশের বাসিন্দাদের আকৃতির মধ্যে প্রকাশ কোরে তুলেছিলেন। যখন তিনি তাঁর কল্পনাশক্তির মাধ্যমে সেই ব্যক্তিত্বকে পাথর, গাছ ও সূর্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন তখন তাকে তিনি যেন আরো অসাধারণরূপে প্রত্যক্ষ কোরেছিলেন। অবশ্য তিনি জানতেন যে এই বস্তুগুলো সচেতন নয়, কিন্তু তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান আর তাদের আকৃতির রূপান্তরের মধ্য থেকেই তিনি আবিষ্কার কোরেছিলেন ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলো। একটা গাছকে সমাহিতচিত্তে চিন্তা কোরতে গিয়ে তিনি তার মধ্যে নিজেকেই প্রতিফলিত দেখেছিলেন। এভাবে এক প্রতীকভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন কোরলো। তাঁর চোখের সামনে সর্বদাই চলে-ছিলো এক রূপান্তরের লীলা। তাই তিনি দেখলেন, একটা বিরাট পাথরের মধ্য থেকে দীর্ঘকাল আগে মৃত একজন ইংরেজ যেন আবার দেহ ধারণ কোরে উঠে আসছে; একটি শিশু আলোকজ্বল শূন্যের মধ্য দিয়ে তার খেলবার চাকার ওপর ভর কোরে চলেছে; মৃত-পুরীর সর্বত্রই আত্মা পাথরীর রূপ ধারণ কোরে কাল-যাপন কোরছে, ইত্যাদি। এই গভীর ভাবদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি এঁকেছিলেন 'সার্কল অব্ দি মনোলিথ্স্' (তেল রং), 'ল্যাণ্ডস্কেপ এ্যাট্ পেন পিটস্' (জল রং), 'ল্যাণ্ড-স্কেপ অব্ দি মেগালিথ্স্' (লিথোগ্রাফ), 'উড্ অব্ দি হিল্' (জল রং), 'ম্যানসানস্ অব্ দি ডেড্' (জল রং) প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতীকধর্মী ছবিগুলো। সম্ভবত তাঁর তেল রঙে আঁকা 'ল্যাণ্ডস্কেপ অব্ দি চ্যানাল ইকুইনক্স' প্রতীকধর্মী ছবিটি সবচাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য। এটা ইংলণ্ডের রাজ পরিবার চড়া দামে কিনে নিয়েছিলেন। ছবিটি যদিও মহাবিষ্বকে উপলক্ষ্য কোরে আঁকা হোয়েছে তবুও এতে যে ন্যাস্ একটা নিজস্ব অর্থ আরোপ কোরেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ছবিটির বিষয়বস্তু হোল—বসন্তের আবির্ভাবে বনানীর চারদিকে প্রস্ফুটিত রাশি রাশি নতুন মুকুল তার রূপকে আরো উজ্জ্বল কোরে তুলেছে; আকাশের বুকে যেখানে সূর্য ও চন্দ্রের দুই বিপরীত আলোকধারা এসে মিশেছে সেখান হোতে বিকীর্ণ সেই আলো—আঁধারি রশ্মি নীচে উপেক্ষিত উদ্যানের সারি সারি গোলাপ-ঝাড় আর অসমান ঘাসগুলোকে এক অলৌকিক রূপে রূপান্তরিত কোরেছে। এ ছাড়া ছবিটির দৃশ্য-মুখের উঁচু জায়গাটির ডানপাশে দেখা যায় কয়েকটি খালি খুঁটি যা' একসময়ে জাল দিয়ে টেনিস্ কোর্ট ঘেরার অবলম্বন ছিলো; আর তার বাঁ দিকে রোয়েছে একটি সাপ। আবার আপন গৌরবে দণ্ডায়মান আকাশচুম্বী একটি গাছের ঝাড়ের একপাশে সূর্য ও আরেকপাশে চন্দ্রের কিরণে আলোকিত হওয়ার ফলে তাকে স্বর্গীয় দেবদূত বোলেই মনে হয়। এই চন্দ্রকে ছবিটির বাঁ দিকে বেশ উঁচুতে দেখা যায় আর তার ডানদিকে কিছু নীচের দিকে রোয়েছে সূর্য। এখানে চন্দ্রের আলোই প্রধান, কারণ তাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপে অঙ্কন করা হোয়েছে। অপরদিকে সূর্যের আলো হোয়েছে গৌণ, আর এই সূর্যই হোল শিল্পীর প্রতিমূর্তি।

পল ন্যাসের শিল্পসৃষ্টির শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আঁকা তাঁর প্রতীক-ধর্মী ছবিগুলো। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের মতো এবারে তাঁর মন আর তেমনভাবে সাড়া দিতে পারলো না। কারণ, জীবনের শেষ কয়েকটা বছর ধরে ক্রমাগত হাঁপানি রোগে ভুগবার ফলে সব কিছুই তাঁর কাছে দুর্বিষহ মনে হোত। আবার এ সময়ে 'রয়েল্ এয়ার্ ফোর্স' আর 'ওয়ার্ আর্টিষ্টস্ এ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি'তে একজন শিল্পী হিসেবে যোগদানের ফলে তাঁর অসুবিধে গেলো আরো বেড়ে। রঙে আর রেখায় বিস্তারিত তাঁর স্বাধীন অবাধ গতি-ছন্দ হোল বাধাপ্রাপ্ত। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর চিন্তার মহানদী এলো শুকিয়ে। কিন্তু তবুও যে কয়েকটি ছবি তিনি এঁকেছিলেন তারা অবিস্মরণীয় হোয়ে আছে চিত্রশিল্পের ইতিহাসে। তাদের মধ্যে তিনটি ছবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচাইতে বেশী।

তারা হোল : 'দি রোজ্ অব্ ডেথ্', 'এনকাউণ্টার্ ইন্ দি আফটারনুন', আর 'টোটে মীর্'। এই ছবিগুলোতে মানুষের অস্তিত্ব পরোক্ষ উল্লেখে প্রকাশিত, সর্বদা অনুপস্থিত। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধে মানুষের ভূমিকাকে যন্ত্র অথবা বোমারু বিমানের মাধ্যমে রূপায়িত কোরে তুলেছেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে স্পেনীয়রা প্যারাযুটের যে নামকরণ কোরেছিলেন তা' থেকেই জন্ম নিয়েছিলো তাঁর 'দি রোজ অব্ ডেথ্' ছবিটির ভাবধারা, আর এটা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত কোরেছিলো। এতে চিত্রায়িত ভাসমান ফুলগুলোর ফুটে ওঠার মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ কোরেছিলেন আকাশের বুকে অনুষ্ঠিত সেই ভয়াবহ অদ্ভুত কাণ্ড। তাঁর জল রঙে আঁকা বিখ্যাত 'এনকাউণ্টার্ ইন্ দি আফটারনুন' ছবিটিতে সিলবারী পাহাড়ের সামনের খোলা মাঠে মৃত সৈনিকের মতো শায়িত অবস্থায় একটি স্পন্দহীন বোমারু বিমানকে দেখা যায়। এটা এমনভাবে ভূপতিত হোয়েছে যার ফলে এর আকৃতির প্রায় অংশই পরিবর্তমান নিসর্গচিত্রের সংগে এক হোয়ে মিশে গেছে। মনে হয়, যেন সিলবারীর দৃশ্যাবলীর মতো ইতিমধ্যে সেটাও মানুষের জীবনস্মৃতিতে একটা আসন দখল কোরে নিয়েছে। মহাযুদ্ধকে উপলক্ষ্য কোরে তেল রঙে আঁকা তাঁর তৃতীয় বিখ্যাত ছবিটি হোল 'টোটে মীর্'। কাউলীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের একটা প্রকাণ্ড স্তূপকে অবলম্বন কোরে তিনি এঁকেছিলেন এই ছবিটি। এতে চন্দ্রের অতি স্নিগ্ধ আলোকের নীচে বিধ্বস্ত জার্মাণ বোমারু বিমানগুলো এক স্থির শান্ত মরু-সাগরের মতোই প্রতিভাত হোয়েছে। এর চারদিকে শুধু বিমানের ভগ্নাবশেষ অর্থাৎ লোহা, সীসা প্রভৃতি অসংখ্য ধাতু রাশীকৃত দেখা যায়। আর সেই নিস্তব্ধ স্থানে সাদা পেঁচার মতো একমাত্র চলমান প্রাণী আমাদের চোখে পড়ে, যাকে অন্যান্য লুণ্ঠনকারী প্রাণীদের গায়ের ওপর নীচু হোয়ে উড়ে তাদেরই অনুকরণে ছায়ান্বিত স্থানগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে ধেড়ে ইঁদুর আর ঐ জাতীয় ক্ষুদ্র জীবগুলোর সন্ধান কোরতে দেখা যায়। এই প্রতীকধর্মী অথচ বাস্তবপন্থী চিত্রায়ণ একমাত্র পিকাসো ছাড়া এই শতাব্দীতে অন্য কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এভাবে এক নতুন আঙ্গিকে স্বতন্ত্রবাদী হোয়ে উঠেছে পল ন্যাসের শিল্প। রঙের ব্যঞ্জনা ও রেখার বলিষ্ঠ উচ্চারণে যে শিল্প তিনি সৃষ্টি কোরেছেন তার ভাব ছন্দ রূপ সবই নতুন। যে দিকেই তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরেছেন, তার পরোক্ষ এবং নিগূঢ় অর্থ তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। মৌলিক প্রতিভার অধিকারী এই মহান্ শিল্পী হয়তো আরো নতুন কোন বিস্ময়কর অবদানে শিল্পজগৎকে সমৃদ্ধ কোরে তুলতে পারতেন, কিন্তু তার আগেই মাত্র আটান্ন বছর বয়সে তাঁর জীবনের দীপ গেলো নিবে। শিল্পের আকাশ থেকে খসে পড়লো একটি উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু শিল্পসাধনার যে আলোকবর্তিকা তিনি প্রজ্জ্বলিত কোরে গেছেন, তারই শিখায় আগামী দিনের শিল্পীরা খুঁজে পেয়েছেন জীবন ও প্রকৃতির গভীর, গোপন উৎসে প্রবেশের পথ। সেই সাধনা চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ কোরে তুলেছে। তাই তাঁর সৃষ্টি কোন প্রাণহীন শিল্পতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়নি, বরং তা' কালকে জয় কোরেছে। আর প্রতীকধর্মী শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে তা দেশে দেশে নন্দিত হবে চিরদিন।

শিল্পী-পরিকল্পিত শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়রে'র একটি দৃশ্য।

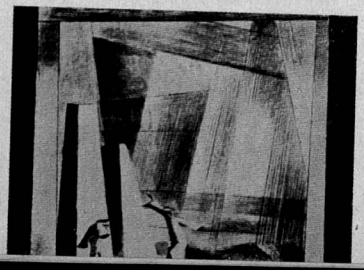

শিল্পী-পরিকল্পিত শেক্সপীয়রের 'মিড সামার নাইটস ড্রিমে'র একটি দৃশ্য।

আসলে বাস্তবের পদবীতে অবাস্তবের এই উন্নয়নই সৃষ্টি; এবং শিল্পী, সাধু ও সত্যসন্ধানী, এঁরা সকলেই সত্তাকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে তার শূন্য সিংহাসনে স্বরূপকে বসানোর প্রয়াসে প্রাণপণ। কিন্তু শিল্পী, সাধু ও সত্যসন্ধানী যেহেতু বিধাতার সমকক্ষ নন, তাই এঁদের সৃষ্টি বিশ্বরচনার মতো নাস্তিকে অস্তিত্বে ভ'রে তোলে না; দৈবাগত উপকরণকে নিকামত সাজাতে পারলেই, এঁরা ধন্য। অতএব এখানেও বস্তুজগৎ আবার এঁদের পেয়ে বসে—এমনকি যাঁরা বিশুদ্ধ গণিতের অথবা স্বাবলম্বী সংগীতের সাধক, তাঁদেরও; এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আলেখ্য প্রভৃতির মতো সুপরিচিত কলায় বস্তুর প্রতিপত্তি সর্ববাদিসম্মত। প্রত্যেকটার উপাদান বা নির্মাণকৌশল অন্যটার কাজে তো লাগেই না, উপরন্তু যে-ভাব একটার আশ্রয়ী, তা অন্যত্র প্রকাশ্য কিনা, সে-সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে; এবং মাইকেল্ এঞ্জেলো-র ডেভিড্-মূর্তি নিছক মনঃপ্রসূত, এ-কথা আর যেই ভাবুক, ভাস্কর নিজে ভাবতেন না। কারণ তিনিই রটিয়ে গেছেন যে সে-প্রতিমার পরিকল্পনায় তাঁর প্রতিভা যত না প্রশংসনীয়, ততোধিক ধন্যবাদার্হ ফ্লরেন্স্-এর নগরসভাকর্তৃক প্রদত্ত মর্মরখণ্ডের আপাতিক আকার; এবং তৎসত্ত্বেও সে-পাথরখানার ধ্যানকালে তিনি যখন তাঁর ধ্যানের সৌন্দর্য হৃদয়ংগম করেছিলেন, তখন ওই দৈবঘটিত প্রেরণাও মননের দৌত্যে অকৃতকার্য হয়নি।

অর্থাৎ স্বপ্নাদ্য সৌন্দর্যের চিরায়মাণ ধারণায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল ব'লেই, আসল খোদাইয়ের বেলা তাঁর হাতুড়ি-ছেনি আর অদৃষ্টের অনুসারে চলেনি, চলেছিল সংকল্পের নির্দেশে; এবং তাই এমন অনুমান সংগত যে বস্তুপ্রধান শিল্প থেকেও মনকে বাদ দেওয়া অসাধ্য।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থের 'অদ্বৈতের অত্যাচার' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

শিল্পদীপঙ্কর | সন্দর্শন চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দের প্রথমেই ভারতীয় রূপকলার যুগোপযোগী যে নবজীবন ও নবীন প্রাণস্পন্দন বাংলাদেশে সূচিত হয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত যে ধারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়ে অব্যাহত রয়েছে, তার প্রবর্তক যেমন অবনীন্দ্রনাথ, তার সর্বপ্রধান ধারক বাহক ও আচার্য নন্দলাল বসু—নানা ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও ক্ষুদ্র স্বার্থ বশতঃ দিকে দিকে যত কেন বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাক্, এ কথা এতই সত্য আর এমনই তথ্য-প্রতিষ্ঠ যে ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, সে আর মোছবার নয়।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্যে নন্দলাল এখনো আমাদের মধ্যে আছেন আর নিত্যসক্রিয় আছেন শিল্পী হিসাবেই, আচার্য হিসাবেও বলা চলে যদি মনে করি যে মহৎ প্রতিভার কার্যকলাপ চোখ এবং মন মেলে দেখে দেখেই তার বিশেষ শিক্ষাটি গ্রহণ করা যায়, সহৃদয় এবং ধীমান যে হয় মৌখিক উপদেশ বা হাতে ধ'রে দেখানোর অপেক্ষা সে রাখে না। এ হল বর্তমানের কথা; অথচ দূর দেশ ও দূর কালের জন্য লিখিত, কথিত এবং পরে অনুলিখিত; উপদেশ প্রভৃতিরও অনেক উপযোগিতা আছে বৈকি। জীবনসাধনা, রূপসাধনা, রসোপলব্ধি—এসবের সঞ্জীবন-

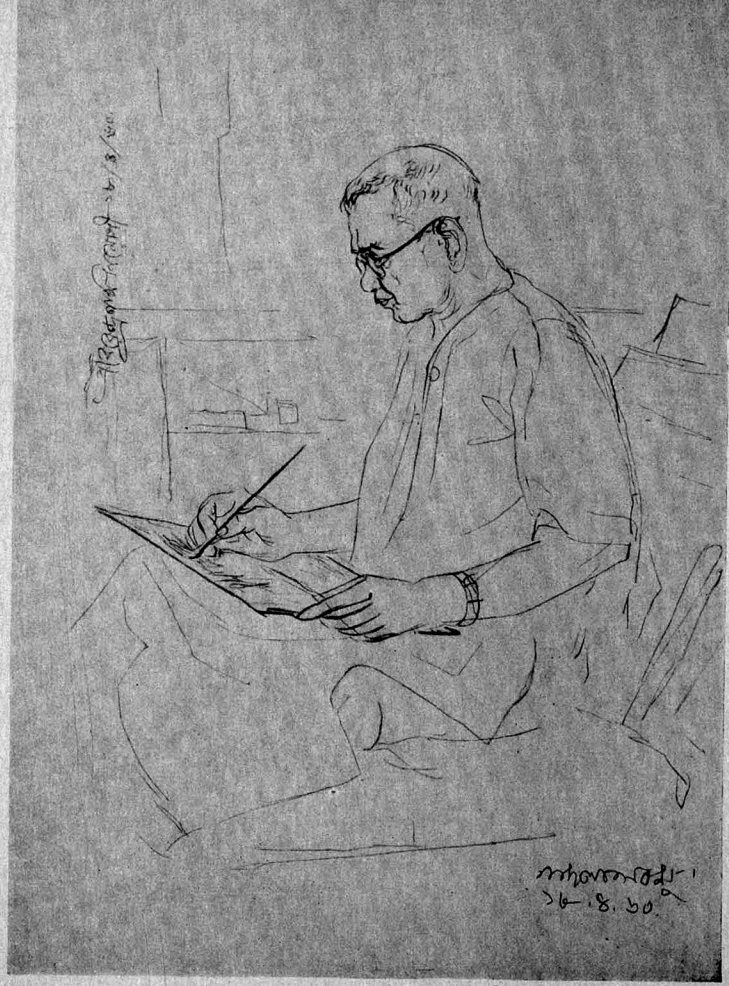

গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত শিল্পদীপঙ্কর নন্দলালের অতি আধুনিক প্রতিকৃতি।

গ্রন্থে প্রকাশিত শিল্পী নন্দলালের দুটি অনাতপূর্ব রেখাচিত্র।

মন্ত্র যাঁরা নিজে গ্রহণ ক'রে অন্যকে দেন তাঁদের কথা, তাঁদের রীতিনীতি প্রকৃতি ঐভাবে লিখিত বা অনুলিখিত হয়ে যদি না পৌঁছুত পরবর্তীকালে তা হলে বহৎ মানবসমাজের ক্ষতির পরিমাণ অল্প হত না। ধম্মপদ জাতককাহিনী এবং সক্রেটিসের 'ডায়ালগ' থেকে শুরু ক'রে এই সেদিনের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পর্যন্ত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে বলা চলে, অবনীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসা আর রসতীর্থাভিসারের অপরূপ কাহিনী অনেকটাই লিপিবদ্ধ হয়েছে যেমন বাগেশ্বরী বক্তৃতামালায়, তেমনি ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে গ্রন্থে—নন্দলালের নানা আলাপ আলোচনা ভাবনা অনুভব লিখিত বা অনুলিখিত আকারে পাওয়া গেছে শিল্পকথা এবং শিল্পচর্চা গ্রন্থে এবং আমরা শুনেছি তাঁর আরও বিস্তারিত স্মৃতিকথা লেখা হয়ে রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়। নন্দলালের নিকট সংস্পর্শে যাঁরা

এসেছেন, তাঁর স্নেহ এবং উপদেশ পেয়েছেন, এক্ষেত্রে তাঁদেরও করণীয় অল্প নয়, এটি মনে হল সদ্যপ্রকাশিত অপূর্ব একখানি বাংলা বই হাতে পেয়ে—'শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল'। 'শিল্পদীপঙ্কর' নামটি কোনো দেশের বা প্রদেশের সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় নন্দলালকে দেন নি, দিয়েছেন নন্দলালের অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অনুজ। সত্যই অতি অপূর্ব এই অভিধা। তুলনায় 'পদ্মভূষণ' বা 'পদ্মবিভূষণ' উপাধির অর্থ কী তা আমরা বলতে পারি নে, আর ভারত-সরকারের বিবেচনায় তিনি যে 'ভারতরত্ন' হন নি এজন্যও আমাদের কোনো খেদ নেই। তিনি তো রত্নই, ভারত-ভারতীর মণিমুকুটের অন্যতম মহোজ্জ্বল রত্ন; যুগের পর যুগ যেতে থাকবে আর দূর থেকে তার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে কালের ঘনায়মান অন্ধকারে, তারার মতো—সে রাত্রে আজকের বহু গ্রহ উপগ্রহের ধার-করা জৌলুষ আর মিথ্যা আড়ম্বর নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে বটে।

সে কথা যাক্। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বা সংকলক শিল্পী বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, মহেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল উভয়েরই স্নেহ এবং সঙ্গ লাভ করেছেন, আশিস এবং উপদেশ পেয়েছেন—শিল্পপ্রসঙ্গে তারই যাকিছু মহার্ঘ অভিজ্ঞান এই বইখানিতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে গ্রথিত ও মুদ্রিত করে সকল রূপরসিক জনকে সত্যই উপকৃত করেছেন। লেখা আর রূপরেখা প্রায় সমভাগে স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। অর্থাৎ, নন্দলালের আলাপ-আলোচনার অনুলেখন আর মূল্যবান চিঠিপত্র যেমন আছে, তেমনি আছে দুখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি আর অনেকগুলি তুলির লেখা বা স্কেচ। ত্রিবর্ণে মুদ্রিত 'সতী' চিত্রটি নন্দলালের ছাত্রাবস্থার কাজ হলেও, নন্দলালের পরিণত প্রতিভার সব লক্ষণই এতেও নিহিত আছে—তাঁর রূপকল্পনার আত্মনিমগ্ন ভাবগাম্ভীর্য, অব্যর্থ রেখাপাত, নিটোল পরিপূর্ণতা আর অবর্ণনীয় অথচ একান্ত অনুভূত কী এক লাবণ্য অথবা দ্যুতি। অন্য চিত্র বা রেখাচিত্রখানি 'পার্থ-সহ পার্থসারথি'—নন্দলালের পরিণত বয়সেরই কাজ; এদেশের যুগ-যুগ-বাহিত শিল্পপরম্পরার সঙ্গে নন্দলালের কতটা আত্মিক যোগ, কোথায় বা বর্তমান এবং ভাবীকাল-উত্তীর্ণ তাঁর নিজস্বতা, রূপরসিকের চোখে সে-সবই এই একখানি ছবিতেই পরিষ্কার ধরা পড়বে।

প্রচল শব্দ ব্যবহার ক'রে স্কেচ-কে নন্দলাল বলেন 'তাড়া কাজ', সত্বর বা তাড়াতাড়ি যা করা হয়—কেউ বা বলবেন 'চলচ্ছবি', মন চলতে চলতে চলতি ছবি যা দেখল এবং টুকে রাখল, কাগজে তুলি কলম বা পেন্সিল দিয়ে তখনকার তখনি লেখা হল এমন না হতে পারে—লেখা হল ঘরে পৌঁছে, একদিন অথবা একবেলা পেরিয়ে অথবা আরও পরে কোনো বটের ছায়ায় কিম্বা কোনো পান্থশালায় ব'সে। এ দেশে একেবারেই নূতন, অথচ নন্দলাল উদ্‌যাপন করে চলেছেন, নিজের ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়েছেন শিখিয়েছেন, এ হল সেই রকম একটা শিল্পচর্যার বা রূপচর্চার অচ্ছিন্নপ্রায় ধারা। নিত্য যেমন অন্নপান গ্রহণের প্রয়োজন হয়, দিনে অনেকবার চা-যোগ বা জল-যোগ ঘটে, তবে শরীরে মনে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য এবং স্ফূর্তি থাকে, এও তেমনি। এ হল রূপসাধক রূপরসিকের চোখ-চাওয়া ধ্যান; সে ধ্যান উঠতে-বসতে হাঁটতে-শুতে বিরাম-বিচ্ছেদহীন বললেই চলে। রূপ-লক্ষ্মীর বর অথবা বরমাল্য পেতে হলে এ ধ্যানের প্রয়োজন আছে। এই ধ্যানের গুণে মন সচল এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে। ন্যাংটা তোতাপুরী বলেন, পিতল-কাঁসার ঘটি (সোনার ঘটি আর কোথায়?) দু বেলা মাজতে হয়, নইলে ছোপ ধরে, মলিন হয়।

স্কেচ কেমন করে করতে হয় সে সম্পর্কে নন্দলালের উপদেশ আর সচিত্র নির্দেশ এ বইয়ে সংকলন করে দেওয়া হয়েছে।

সংকলন করা হয়েছে আরও অনেক উক্তি, অনেক লিখিত মন্তব্য, যা থেকে এক দিকে যেমন প্রাচ্য, বিশেষতঃ ভারতীয়, রূপরীতির মর্মে প্রবেশ করা যাবে, অন্য দিকে তেমনি এ যুগের নানা বিচারবিভ্রান্তির মধ্যে দেশকালে প্রতিবিম্বিত অথচ নিখিল-দেশকালের-অতীত সত্যসুন্দর দেবতার সন্ধান কোন্‌খানে তারও কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।

বেশি কথায় কাজ নেই। মোটের উপর বলা চলে, সহৃদয় শ্রদ্ধাবান্ গ্রন্থকার লোকোত্তর শিল্পপ্রতিভার সাক্ষাৎভাবে যতটুকু পরিচয় পেয়েছেন শিল্পী নন্দলালের চলায় বলায়, চিঠিপত্রে ও স্কেচে, তার সমস্তই সযতনে রক্ষা ক'রে আজ সমান যত্ন ও নৈপুণ্য-সহকারে

'দুর্গাপুজো দেখতে যাচ্ছে'—
নন্দলাল বসু অঙ্কিত
গ্রামীন জীবনের একটি
অনবদ্য রূপ।

জনসমাজের উদ্দেশে এই বইখানিতে ধরে দিয়েছেন। নিজেকে প্রচার করতে চেষ্টা করেন নি, তবু তাঁর দৃষ্টি-শীল ধী ও শ্রদ্ধা-শীল চিত্ত স্বতই প্রকাশ পেয়ে আমাদের আনন্দ দিয়েছে। লেখার সঙ্গে সঙ্গে এক বর্ণে ও দুই বর্ণে স্কেচ বা 'তাড়া কাজ'গুলি যেভাবে ছাপা হয়েছে তার পরিপাটী সৌন্দর্যে বাংলা গ্রন্থ-মুদ্রণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এটিকে একেবারেই অভিনব মনে হয়, একটি নূতন দিক দেখিয়েছে। সহসা বইটির শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে মনে হয় : আহা, এখনি ফুরিয়ে গেল!

এজন্যই আর একটি কথা বলার আছে সব-শেষে। রূপশিল্পী ও আচার্য নন্দলালের সঙ্গলাভ করেছেন দিনের পর দিন, তাঁর বহু চিঠি বহু স্কেচ বহু চর্চিত মন্তব্য বা ভাবনা ডেস্কে বাক্সে সঞ্চয় করে রেখেছেন আজও, নন্দলালের ছাত্র বা ছাত্রী, তাঁর স্নেহপ্রীতির পাত্র বা পাত্রী এমন তো আরও অনেকেই আছেন। তাঁরা কি বৃহৎ জনসমাজকে বঞ্চিত রাখবেন? ভেবে দেখতে গেলে যে ঐশ্বর্য 'নাস্ত ধন' মাত্র, তার ফলভাগী করবেন না দেশের সকলকে, তথা এ যুগ এবং পরবর্তী বহু যুগকে? বরেন্দ্রবাবু যা করেছেন, অনেকেরই এ জাতীয় চেষ্টাই একত্র গ্রথিত হলে নতুন যুগের মহিমোজ্জ্বল একটা দিকের পূর্ণায়মান একটি রেখাচিত্র ফুটে উঠবে রসিকজনের মনের পটে।

শিল্পাজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল :
লেখক—বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী।
প্রকাশক—ভারতবাণী প্রকাশনী। মূল্য : পাঁচ টাকা।

নীরদ মজুমদার-এর
একক চিত্র-প্রদর্শনী 'অন্তহীন ডানা'র
একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র।
চিত্রটির বিষয়—পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক
মাতা বিনতার উদ্ধারকল্পে অমৃত-আহরণের দৃশ্য।
মহাভারতের এই অমৃতময় উপাখ্যান
শিল্পদর্শনের প্রকৃষ্ট রূপকল্প হিসাবে ব্যবহার
কোরেছেন নীরদবাবু।
'অন্তহীন ডানা' প্রদর্শনীর সামগ্রিক
অর্থ এই চিত্রটিতে
বিধৃত কোরে
দর্শক সাধারণের রসোপভোগ
তৃপ্ত কোরতে সক্ষম হোয়েছেন শিল্পী।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

অন্তহীন ডানা : নীরদ মজুমদারের একক চিত্র-প্রদর্শনী।

'পাখী' ব্রাঙ্কুসি।

উনিশশো সাতান্ন সাল। নব-নব শিল্প-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল প্যারি। অনুষ্ঠিত হোল ভারতীয় চিত্রকর নীরদ মজুমদার-এর একক চিত্র-প্রদর্শনী : ইমাজ এক্লোজ। শিল্প-রসিকদের নানারূপ জিজ্ঞাসা। দর্শক-সাধারণের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা।

অতঃপর শিল্পীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, কোলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউসে ওই চিত্র-প্রদর্শনীর পুনরায় অনুষ্ঠান ও একজন বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ।

কিছুদিন আগে চৌরঙ্গীর মার্কিণ প্রচার-দপ্তরের প্রদর্শনী কক্ষে নীরদ মজুমদার-এর একক চিত্র-প্রদর্শনী 'অন্তহীন ডানা' দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেছিল আমাদের। 'অন্তহীন ডানা'—এই নামের আড়ালে 'মহাভারতে'র একটি অমর উপাখ্যান প্রজ্ঞান-চিহ্নিত। (পনেরখানি চিত্রে এই কাহিনীটি গ্রথিত)। মাতা বিনতাকে উদ্ধার-কল্পে পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক অমৃত আনয়নের অভিযান কাহিনী। দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের আঘাত প্রতিহত হোয়ে ফিরে গেলে মৃত্যুহীন গরুড় তাঁর বজ্রের সম্মানে ডানা থেকে খসিয়ে দেয় একটি পালক —বিস্তার যার অনন্তে।

উত্তর আমেরিকার ভারতীয় শিল্প।

প্যারির 'ইমাজ এক্লোজ' প্রদর্শনী দর্শনান্তে প্রখ্যাত ফরাসী শিল্প-সমালোচক জানীন্ ওবোআইয়ে লিখে-ছিলেন, 'প্রতীচ্য শিল্প-সমালোচক এবং ভারতীয় শিল্পের ঐতিহাসিকদের মাঝে এ এক নতুন প্রেরণা। তাঁর নিজস্বতা তিন ধরণের : প্রথমত—তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস, দ্বিতীয়ত—ছবির একটি সেট, অর্থাৎ ক্রমিক সমগ্রতা, তৃতীয়ত—শিল্পবিদ্যার ভঙ্গীতে 'ফ্রেতিস' যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর সুদৃঢ় রেখাগুলি।'

উপরিস্থিত উদ্ধৃতির তাৎপর্য বিশেষভাবে গ্রহণীয় কেননা 'অন্তহীন ডানা' নামক ইংরাজীতে লিখিত পৃথক পুস্তিকাটিতে শিল্পী স্বয়ং লিখেছেন, 'গঠনের (স্ট্রাক্চার) দিক দিয়ে মিল রয়েছে 'ইমাজ এক্লোজ' প্রদর্শনীর সংগে এ-প্রদর্শনীর।' এ-ছাড়া প্রথমোক্ত প্রদর্শনীর কিছু ছবিও এখানে দেখা গেল।

ডানদিকের প্রথম ছবি : উত্তর আমেরিকার শিল্প।

ডানদিকের দ্বিতীয় ছবি : 'প্যাথিদের গ্রাম' : সুসা প্রথম।

কাবুল মিউজিয়ামে রক্ষিত শিল্প-নিদর্শন।

উত্তর আমেরিকার আদিম-নক্সা।

'পাখীদের থাম' : সুইলাক, ফ্রান্স।

ইউরোপ ও এশিয়ার ঐতিহ্যমূলক ও আধুনিক শিল্পধারার সঙ্গে সান্নিধ্য-ধন্য নীরদবাবু বিভিন্ন সংগ্রহশালা এবং আর্ট গ্যালারি পর্যবেক্ষণান্তে যে শিল্প-সত্যের উদ্ঘাটনে সক্ষম হোয়েছিলেন তা-ই তাঁর নিজস্ব ঢং-এ পঞ্চাশখানির উপর চিত্রে বিধৃত কোরে উপহার দিয়েছেন আমাদের।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেখতে পাই মানুষের সীমিত জীবন-ধারার মাঝে 'ইমেজে'র উদ্ভাবনা। আর সর্বকালের সর্বদেশের শিল্পীদের প্রিয় 'ইমেজ' যা একাধারে অভিব্যক্ত করে বাস্তবজগতের সাধারণ ভাবনা-কল্পনা ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক কল্পলোক তা হোচ্ছে পাখি। সংস্কৃতে যাকে বলা হয় বিহঙ্গম। তাই

'লেডা' : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

বোধকরি নীরদবাবু কাল এবং অনাদি অনন্তের একটা ধারণা সৃষ্টি কোরে নেবার মানসে বেছে নিয়েছেন পক্ষীরাজ গরুড়কে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'লেডা', চৈনিক স্কটিকের পাখি, যবদ্বীপের কিন্নর, মিশর, এশিরীয় ও গ্রীকদেশের শিল্প-কর্ম, এমনকি বাংলার নক্সী কাঁথাকেও ভিত্তি কোরে 'অন্তহীন ডানা'র প্রতীক ধর্মীতা পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময়তায় বিস্তৃতি লাভ কোরেছে। 'এ যেন বর্তমান কালের শিল্পীর সঙ্গে চিরঞ্জীবী শিল্পকলার কথোপ-কথন' লিখেছেন মজুমদার মহাশয়। তুলি হাতে কোরে ভাবনা বা চিন্তা—একজন ব্যক্তির স্বীয় উপলব্ধিকে উদ্ঘাটনের প্রয়াস, কিন্তু যখন অপরের তুলির আড়ালে নিহিত ভাবনা-চিন্তাকে আত্মসাৎ করার প্রশ্ন এসে পড়ে —তখন সেটাকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর-কি বলা যায়। অনুরূপ সৃষ্টির প্রাক্কালে কিম্বা যখন কোন রূপকর্মের ব্যাখ্যা কোরতে বসি—আমাদেরও ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হোতে হয়—যেটা কিনা উপলব্ধি এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণ।

এর ফলাফল সম্পর্কে নীরদবাবুর নিজের ভাষাতেই বলি : It is true that the result will be neither an original nor a copy. It will be, if one may say so, a sort of 'transcreation', an active contemplation with transposition of one's own self.

ঊনিশ শতকের এদেশী একজন অখ্যাত শিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেল নীরদবাবুর এই প্রদর্শনীতে এসে। নত্যলাল দত্ত, শিল্পীর মতে, পরবর্তী কালে তাঁর আপন দেশে জন্ম নিয়েছেন এমন অনেক দক্ষরূপকারের চেয়েও যাঁর স্থান উচ্চে। যে-সব শিল্প-সমস্যা নিয়ে

'বিষ্ণুর গজেন্দ্র-উদ্ধার' : ভাগবত পুরাণ।

আধুনিক চিত্রশিল্পীরা গলদঘর্ম সেই সব সমস্যারই স্বকীয় সমাধানে প্রয়াসী দেখা যায় এই অখ্যাত শিল্পী কারিগরের শিল্প-কর্মে।

তৈলমাধ্যম শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে একটি সমস্যাসংকুল মাধ্যম তো বটেই, তাছাড়া মুরাল রচনার পক্ষে আদৌ উপযোগী নয় বোলেই অনেকের ধারণা। তথাচ নীরদ-বাবুকে দেখি তৈল মাধ্যমেই অধিকতর সাবলীল এবং এ'র ছবির পরিধি যেরকমই হোক্ না কেন শিল্পী মুরাল কল্পনা কোরেই যেন আঁকা আরম্ভ করেন। এ'র রচনা সুরু হয় একটি কেন্দ্রস্থল থেকে এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। "যাই হোক তাঁর ছবিকে ভালো লাগাতে হোলে আগে জানতে হবে চিত্র-সূত্রের আরম্ভ কোথায়। এবং এর জন্যে দর্শনি শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক ক্যানভাস এবং উপাদানের মধ্যে একটি মধ্যবিন্দু দেখতে পাওয়া যাবে এবং সেই বিন্দু শুধু রহস্যময় ছবির চাবিকাঠিই নয়; উপরন্তু তার সাহায্যে এক ছবি থেকে অন্য ছবিতে যাওয়া যায় সেই সূত্রে, 'যে সূত্র গলার হারের মুক্তোগুলোকে গ্রথিত

'মেঘের পট-ভূমিকায় পাখি' : জর্জ ব্রাক।

'থাকের' : ইজিপ্টের মন্দির-শিল্প।

ভ্যানগগের রূপ-প্রেক্ষায় চৈনিক মোরগ।

'দেবী যোদ্ধা' : নন্দলাল দত্ত।

গরগেট : উত্তর আমেরিকা।

ইজিপ্টের ইসলাম পর্বের শিল্প।

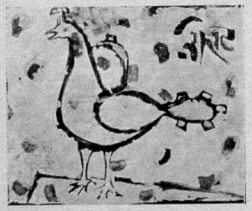

কোন একটি পারশিয়ান পাখি।

ফ্রান্সের নরবোনের (দশম শতক) শিল্প।

করে' (সূত্র-আত্মন্)। এই সেই মধ্যবিন্দু 'হৃদ-পুষ্কর'-এর মধ্যভাগ। এই মধ্যবিন্দুগুলি অব্যক্তের প্রতীক। স্থির এবং অবিচল, আর তাকে ঘিরেই বাস্ত জগৎ উন্মীলিত, নিমীলিত ও তাদেরই স্থিরতা প্রকাশিত হোয়েছে। (জানীন ওবোআইয়ে)"

প্রসঙ্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে (অচ্ছন্ন শিল্পে?) যে সব প্রতীক-প্রতীমার সমাবেশ হয় তা শিল্পীর একান্ত কল্পনাজাত বোলে অভাবনীয় হোতে বাধ্য। কোনো দর্শন বা শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে তেমন সমাবেশ হোলে তার খানিকটা সামাজিক হবার সম্ভাবনা থাকে।'

চিন্তা-ভাবনায় বিপর্যস্ত, পীড়িত নয় নীরদবাবুর শিল্পী-মানস। সচেতন যুক্তিকেন্দ্রিক তাঁর শিল্পীসত্তা। অধুনা ভারতের সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্যের শিল্প-বক্তব্য ও আঙ্গিকের অনুকরণ ও অনুসরণে রত। নীরদবাবু পাশ্চাত্য প্রয়োগ-পদ্ধতিকে ভারতীয় শিল্প-বক্তব্য (নিজের ধরণে) এবং প্রকরণে নিয়োজিত করার জন্য পৃথক একটি মূল্যায়ণের দাবীদার হোয়ে সমুপস্থিত। নীরদবাবুর কাছে আরো প্রজ্বল প্রজ্ঞাসমন্বিত সৃষ্টিকর্মের প্রত্যাশা জানিয়ে 'অনন্তহীন ডানা'-প্রসঙ্গে ছেদ টানা যাক।

পরিশেষে উল্লেখ্য, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারল ফ্রীডম এইরূপ একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতের একাংশও যদি তাঁদের সক্রিয়তায় মহান আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হয় তবেই ঐকান্তিক শুভেচ্ছার সার্থকতা।

তর্পণ-পাত্র : মুজে দ্য লুভার, প্যারি।

চৈনিক জেডের পাখি।

জাভার কিন্নর (অষ্টম শতক)।

গ্রীক স্ফিংস্।

দেবকুমার রায়চৌধুরীর একক-প্রদর্শনী।

ইতালী-প্রত্যাগত শিল্পী দেবকুমার রায়চৌধুরী কোলকাতার অ্যাকাডেমী ভবনে একটি একক-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন কিছুদিন আগে।

ইতালী ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ—যথা ইজিপ্ট, স্পেন, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, সুইৎসারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের শিল্পকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল তাঁর। এই পরিচয়-লাভের সুযোগের সদ্ব্যবহারই কোরেছেন তিনি। সমৃদ্ধ হোয়েছে তাঁর শিল্প-অভিজ্ঞতার স্তরগুলি।

প্রবাসে অবস্থানকালে রোমের ম্যুজিও ওরিয়েণ্টালে অনুষ্ঠিত তাঁর একক-প্রদর্শনী বিদেশী দর্শক তথা শিল্প-রসিকগণের রূপদৃষ্টিকে কোরেছিল চমৎকৃত ও পুলকিত।

য়ুরোপ যাত্রার প্রাক্কালে, কোলকাতায় দেবকুমারবাবু যে প্রদর্শনীটি কোরে যান—তাও এদেশে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভে সম্মানধন্য হোয়েছিল সেদিন।

শিল্প-সাধনায় চরম সাফল্য হয়তো অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না, কিন্তু সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে দেশে দেশে বিভিন্ন মানুষের ঐকান্তিক অভিনিবেশ, হৃদয়ের সন্নিহিতি শিল্পীকে স্বীকৃতি দানেরই নামান্তর। এই স্বীকৃতিও জোটে না সকলের কপালে।

দেবকুমারবাবুর এবারের এখানকার একক-প্রদর্শনীতে মোট ছবি প্রদর্শিত হোয়েছিল ছাব্বিশখানা। ছ'খানা গ্লেজ্‌ড টালি।

'সুষমা' 'যৌবন', 'বিশ্রামরতা শ্যা নারী' প্রভৃতি চিত্রগুলি রঙ ও রেখার বিন্যাসে আশ্চর্য মনোগ্রাহী লাগলো আমাদের কাছে।

'কার্ণিভাল' একটি বিশিষ্ট ছবি এ-প্রদর্শনীর। 'রঙের বিন্যাস', 'বিন্যাস', 'একটি মুখ' প্রভৃতি চিত্রও সবিশেষ উল্লেখ্য।

গ্লেজ্‌ড টালি অর্থাৎ নক্সা করা টালিগুলি অভিনব। শিল্পীর সুদক্ষ রূপায়ণে ঘুচে গেছে তাদের সামান্যতা। উপকরণ যাই হোক্ না কেন, রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির দাবীতে প্রত্যেকেই সমান সমকক্ষ।

প্রায় অধিকাংশ ছবিতেই লক্ষ্য করা গেল প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ-করা উপাদানের সমাবেশ। প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসার অনেকক্ষণ পরও শিল্পী-চরিত্রের রসঘন আনন্দময় একটি দিক উন্মোচিত কোরে চলে যেন তাঁর ছবিতে ব্যবহৃত রঙগুলি। চিত্র-বর্ণিত বিষয়ের আকারে এবং বর্ণে সাদৃশ্য না থাকলেও চিনে নেওয়া যায় মূল রূপের কাঠামো।

দেবকুমারবাবুর নিজের ভাষাতেই স্বচ্ছ হবে তাঁর শিল্প-সাধনার অন্বিষ্ট : সমকালীন জগতে যে-সব নব নব আঙ্গিক ও প্রকাশরীতির উদ্ভব হোয়েছে ও হোচ্ছে, তাদের সম্যক্ পরিচয় লাভ ও উপলব্ধি সমানভাবে প্রয়োজন। গত দু'বছরে আমার সে সুযোগও ঘটেছে এবং আমার চিত্রলিপিতে তাদের বিশিষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। ...অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট প্রমুখ কয়েকটি শিল্প প্রকাশধারা ক্রমশ আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে। এর সহজ কারণ এগুলি সব দেশের আর্টের মূলকথা।...প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারাগুলি সম্বন্ধে আমি শ্রদ্ধাশীল, এদের সঙ্গে কমবেশি পরিচয়ও অনেকদিনের। কিন্তু এদের আত্মস্থ কোরে সমকালীন শিল্প-কর্মের নতুন ক্ষেত্রে কী ভাবে প্রয়োগ করা চলতে পারে (বা পারে না) তা প্রতিটি চারু-শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিগত সমস্যা। বাঁধা ধরা নিয়মের ব্যাপার এটা নয়।...আমি আজ শুধু এই বলতে পারি যে, আমার ভবিষ্যতের চিত্রকল্পেও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকবে। তার ফলাফল আমি নিজেই জানি না।

আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা কোরব দেবকুমারবাবুর সেই ভবিষ্যত প্রদর্শনী দেখার জন্য যে প্রদর্শনীতে দেখা যাবে তাঁর বলিষ্ঠতম আত্মপ্রকাশ।—**শঙ্কর দাশগুপ্ত।**

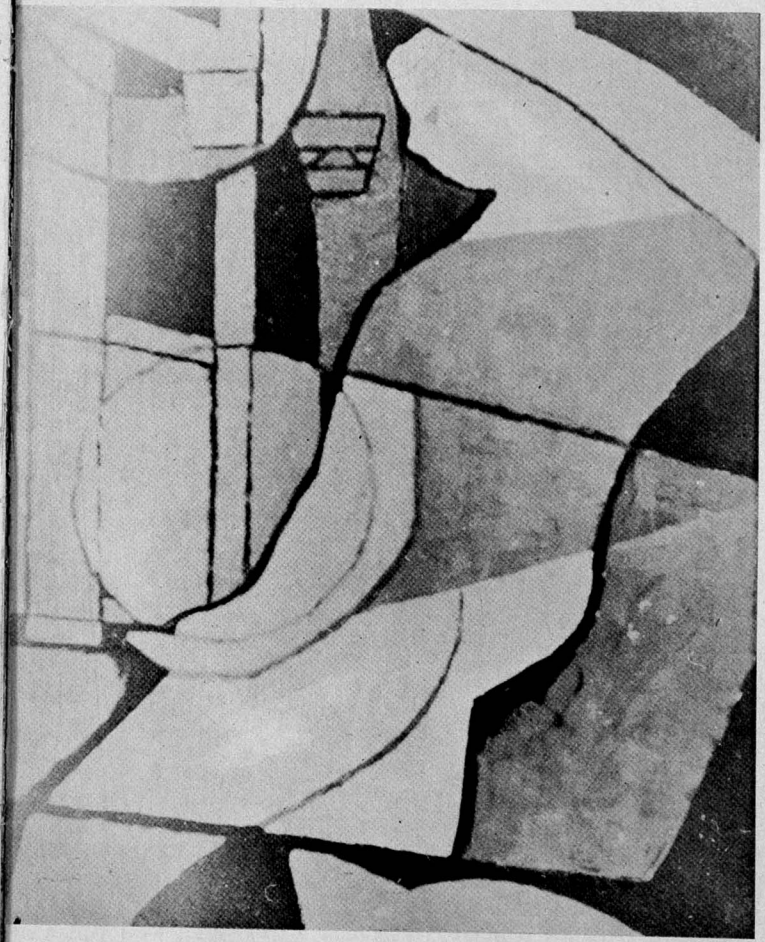

ডানদিকের পৃষ্ঠায় : ইতালী-প্রত্যাগত শিল্পী দেবকুমার রায়-চৌধুরী, বর্তমানে যিনি গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক অঙ্কিত একটি তির্যকধর্মী চিত্রের নিদর্শন।

খবরাখবর

শাড়ীর নক্‌সা অঙ্কনরতা শিল্পী মায়া রায়।

শিল্পী মায়া রায় : একখানি ঐতিহাসিক শাড়ি।

প্রথমটা তো বিশ্বাসই করতে পারিনি।

হাতের তুলিতে ভাষা ফুটবে, ভারতাত্মার ভাষা। রঙের আঙিনাকে ফুল ফুটবে, পাখি ডাকবে। আয়োজনের ঘাটতি থাকবে না কোথাও। তাও কি সম্ভব? বিশেষত, একটি রেশমী বস্ত্র-খণ্ডের বুকে। রমণী শরীরকে রমণীয় করে তোলার জন্যে সূক্ষ্ম শিল্প-সৌকর্যময় একটি আয়োজন—একখানি ঐতিহাসিক শাড়ির জন্ম-কাহিনী।

প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি। এ যে অসম্ভব। কতখানি ধৈর্য, কতখানি অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা কি উনি জানেন না? তার ওপর আছে শিল্পের নিপুণ বুনুনি আর কলা-কৌশলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরি। রঙের পরিভাষায় ফোটাতে হবে উৎসবমুখর ভারতের মর্মবাণী।

শ্রীমতী রায় বললেন : পারবো। আপনি দেখুন—

বললাম : আপনাকে নিরুৎসাহিত করছিনে। কিন্তু সময়, ধৈর্য, অধ্যবসায়—এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দরকার আপনার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে।

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী রায় তাঁর শিল্প-পরিকল্পনার একটা মোটামুটি নক্‌সা আমার সামনে তুলে ধরে-ছিলেন। পরিকল্পনার ব্যাপকতা এবং গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল যতখানি, তার চেয়ে বিস্মিত করেছিল অনেক বেশি। মনে আছে, সেদিন ঠাণ্ডা গলায় বলে ছিলাম : বড় জোর মাঝে মাঝে এসে উৎসাহিত করে যাব অবশ্যি। কিন্তু—চায়ের কাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ চুমুক দিয়ে বল্‌লাম : তাতে কি কিছু হবে? কাজটা যে দুরূহ।

সেদিন আসবার সময় মনে ছিল সন্দেহ। ভেবেছিলাম, পরে একদিন গিয়ে দেখবো ঠাণ্ডা চায়ের কাপের মত সব জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু হলো ঠিক উল্টো। গিয়ে দেখি, কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। রেখা ঘুরেছে, রং ফুটেছে সিল্কের ওপর, আধো আধো কথার কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে সিল্কের সমগ্র আয়তনটি। এবারে আরো বিস্ময়। সেবারে বিস্ময় ছিল মনে; এবারে বিস্ময় শাড়িতে। পাকানো সিল্কের শাড়ি, দৈর্ঘ্যে বারো হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ। সমস্তটাকেই রূপ দিয়েছে এক নম্বর, জিরো নম্বর, ডবল জিরো নম্বরের তুলি। অর্থাৎ দরকার হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতে হবে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজ, স্থায়ী ভারতীয় রঙের ব্যবহার। আর বিষয় হলো অতীতের কয়েক ফালি স্বপ্ন। অসংখ্য রমণীর শুচিস্মিত শোভাযাত্রা। বলা চলে, সৌন্দর্যের অফুরন্ত মিছিল। লীলায়িত দেহভঙ্গীতে এগিয়ে চলেছেন সুন্দরীতমারা, কারো হাতে দোলায়িত চামর, কারো হাতে অভিনন্দনের বরণ ডালা, কারো হাতে শঙ্খ, অঙ্গে অঙ্গে ফুল ফোটে, পদাঘাতে একেক জগৎ জেগে জেগে উঠছে। পাল্কী বাহকদের চলার ছন্দে মুখর হয়েছে পথ। পেছনে এগিয়ে চলেছেন গজরাজ, নিয়ে যায় এক স্বপ্নময় জগতে, এক রূপরসশব্দ স্পর্শ-ময় কল্পলোকে।

বিচ্ছিন্নভাবে বা বিশ্লেষণাত্মক প্রকরণে বিচার করলে একেকটি চিত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গীতে আঁকা একেকটি সম্পূর্ণ একক। যেন অতীত যুগের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা কোন নায়িকা নেমে এসেছে তার অতি পরিচিত ভঙ্গীতে। প্রত্যেকটি ছবিই নিখুঁত। আবার সামগ্রিক-ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রঙে রেখায় এমন আশ্চর্য ঐক্য ইংরেজীতে যাকে বলে হারমনি—তা অন্য কোথাও কদাচিৎ দেখা যায়। সমস্ত বিচ্ছিন্ন চিত্রাবলী কোথায় হারিয়ে যায়, সেখানে জেগে ওঠে একটা অখণ্ড গতি, একটা নৃত্যচঞ্চল ছন্দ, একটা অপরিম্লান ঐকতান। অসংখ্য রেখায়, বিচিত্র রঙে, অজস্র সুরের সমাহারে রচিত হয়েছে একটি গান। বলাবাহুল্য, সে গানটি একান্তভাবে ক্ল্যাসিক্যাল।

মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি এই ছবি। কোথায়?

অতীতের একফালি স্বপ্ন যেন রূপলাভ কোরেছে
শিল্পী মায়া রায় অঙ্কিত শাড়ীর নক্‌সায়।

লীলায়িত তার গমনভঙ্গী। রঙে, রেখায় একটা অপূর্ব ছন্দ, গতির সমারোহ। সর্বোপরি একটা আশ্চর্য সুমিতি-বোধ। কোথাও বাহুল্য নেই, অতিশয়োক্তি নেই। অথচ বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বিশাল ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের এই চিত্র-সম্ভার, কোথাও ক্লান্তি নেই, কোথাও জড়তা নেই, ছন্দপতন নেই। রঙের ব্যবহারেও অপূর্ব পরিমিতি-বোধ। চোখ ধাঁধানো রঙের জৌলুষ নেই। কিন্তু আছে নিপুণ বর্ণ-সৌষমা, যা দর্শকের হাত ধরে কোথায়? কিন্তু তাকে ফেলে এসেছি অতীতের বুকে। আবার তাকেই ফিরিয়ে এনেছেন এ-যুগে, এই বর্তমানের মণিকোঠায়। এবং তিনি হলেন শ্রীমতী রায়।

মনে হলো, রূপময় ভারতের ইতিহাসের একটি পাতা স্বপ্নের মতো রূপ পরিগ্রহ করেছে একালের চোখে। কিংবা সেকাল। সেই কালিদাসের কাল। সেই কল্পময়, স্বপ্নময় ভারত, যেখান থেকে আমাদের চির-নির্বাসন হয়েছে, যাকে আমরা ফিরে পাবো না কখনো।

শিল্পী মায়া রায় রূপায়িত শাড়ীর নক্‌সা : সুন্দরীতমাদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে অভিনন্দনের বরণ-ডালা।

খেয়াল ছিল না শ্রীমতী রায়ের। আমারও না। কতক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না। কতক্ষণ পরে শ্রীমতী রায় জিজ্ঞেস করলেন : কখন এলেন?

: অনেকক্ষণ—

: বুঝতে পারি নি, কিছু মনে করবেন না।

শ্রীমতী রায়ের মধ্যে বাঙালী গৃহস্থ ঘরের বধূকে দেখলাম। বললাম : আমিও বুঝতে পারি নি। দেখলাম অসম্ভবকে সম্ভব করার যাদু আছে আপনার হাতে। লজ্জিত হলেন শ্রীমতী রায় : ওসব রাখুন আপনার বাগ্‌-বিস্তার। বলুন, কেমন হচ্ছে। জবাবে বলেছিলাম : নাই-বা বললাম আমি। আমার মুখ থেকে শোনার চেয়ে অনোর মুখ থেকে শোনাবে ভালো। সত্যি কথা কিন্তু বাসি হলে মিষ্টি হয়। তাই বোধ হয় আজ সেই কথাটিকেই নতুন করে বলার জন্যে আমারই ডাক পড়লো।

তারপর কতবার গেছি শ্রীমতী রায়ের বাড়িতে। তাঁর কাজের অগ্রগতি লক্ষ্য করেছি। দিনে দিনে রূপরূপান্তর পেরিয়ে তাঁর কাজ এগিয়ে চলেছে একটি লক্ষ্যের দিকে। প্রাণ-চাঞ্চল্যের রূপময় তীর্থে। এসেছে ঋতুরঙ্গশালার ষষ্ঠ ঋতু—রূপময়, গানময়, প্রাণময় বসন্ত। নায়িকাদের অঙ্গে অঙ্গে, নৃত্যছন্দে তারই প্রতিফলন। মনে পড়লো, গ্রীস দেশের কোন একটি বিখ্যাত প্রাচীন পানপাত্রের কথা। কোন উদ্দেশ্যে তা তৈরী হয়েছিল, কেউ জানে না। কিন্তু সেই বিশ্ববিশ্রুত পানপাত্রটির অঙ্গে অঙ্গে রূপের খেলা। সম্ভবতঃ সে একটি উৎসবের চিত্র। মাঝখানে যজ্ঞবেদী, পাশে মন্ত্রোচ্চারণরত পুরোহিতেরা। দূরে বাজছে বাঁশী। যৌবনমদেমত্ত সৈদিনের নায়িকারা ছুটে চলেছেন, পেছনে ছুটেছেন যুবকেরা। না, কোনদিনই তাঁরা ধরতে পারবেন না তাঁদের ঈপ্সিততমাদের। চিরযৌবন তাঁদের চির-অটুট। সময়ের নিষ্ঠুরতা সেখানে পরাজিত। আর সেই গান চির-অক্ষয়। চির-মধুর।

শ্রীমতী রায়ের আঁকা শাড়িতেও যুবতীরা চলেছেন অর্ঘ্য সাজিয়ে। কাকে বরণ করতে? কে সেই ভাগ্যবতী? কেন্দ্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা। তাঁকে চিনতে বিলম্ব হয়

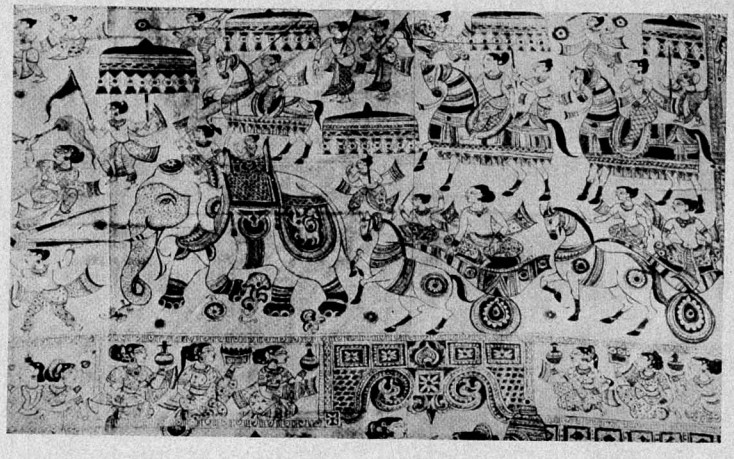

শিল্পী মায়া রায় কৃত শাড়ীর উপর বিচিত্র শোভাযাত্রার নক্‌সা।

না। কিন্তু কে তিনি?

শাড়ি আঁকা শেষ হলে একদিন গেলাম শ্রীমতী রায়ের বাড়ি। এবারে লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখেমুখে অসীম ক্লান্তি। দৈনিক গড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করে পঁচাত্তর দিনে শেষ করেছেন শাড়িটা। এর আগে আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী রায় অনেক ছবি এঁকেছেন, জয়-মাল্য পেয়েছেন দিল্লী, কলিকাতা, পিকিং, মস্কো থেকে। কিন্তু এভাবে ক্লান্ত হতে তাঁকে কোনদিন দেখি নি। অবশ্য যে বিরাট পরিকল্পনা তিনি হাতে নিয়েছিলেন, তাতে এই ক্লান্তি অস্বাভাবিক কিছুই নয়। দীর্ঘ দিনের শ্রম, দীর্ঘ রাত্রি-জাগরণ, অক্লান্ত অধ্যবসায় এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই সীমাহীন ক্লান্তির মাঝেও একটা পরিতৃপ্তির আনন্দ লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করে আমিও আনন্দ পেয়েছি।

শ্রীমতী মায়া রায় প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেন রায়ের সহধর্মিণী। শ্রীযুক্ত রায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : শ্রীমতী রায়ের অধ্যবসায় আর ধৈর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। শ্রীমতী রায় তখন ঘরে ছিলেন না। এদিক ওদিক চেয়ে বললাম : আমিও—

শ্রীমতী রায় ফিরে এলেন। বিদায় নিতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। শ্রীমতী রায় জিজ্ঞেস করলেন : কি দেখলেন? পেরেছি?

উত্তরে বলেছিলাম : কিন্তু আপনার আঁকা শাড়িতে বরণের যে এত আয়োজন, এত বিচিত্র অর্ঘ্য রচনা—এ সব কার জন্যে? কে সেই ভাগ্যবতী?

শ্রীমতী রায় শুধু হাসলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে পড়লো, রাণী আসছেন।

—ফণীভূষণ আচার্য

পিকাসোর চোখে গাগারিন।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিক্রমার স্বপ্ন সফল হোতে চোলেছে মানুষের। সোভিয়েতের তরুণ যুবক ইউরী গাগারিন হোচ্ছেন প্রথম মহাশূন্যচারী মানুষ যিনি

মহাশূন্যদেশে পৃথিবীবাসীর পথ চিহ্নিত কোরে দিলেন।

আর এই অসামান্য সাফল্যে উৎফুল্ল হোয়ে ছবি এঁকেছেন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো। প্রকাশিত হোয়েছে প্যারিসের বহুল-প্রচারিত দৈনিক পত্র 'লুা মানিতে'। পথচারী মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি ওই ছবিটির দিকে : উড়ে চলেছে একটি সাহসী পারাবত, মুখে তার একখণ্ড শস্য। পারাবতের উড্ডীয়মান ডানায় গাগারিনের মুখ। বিজয় উল্লাসে বাঙ্ময় চক্ষু দুটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো।

পিকাসো অঙ্কিত 'গাগারিন'।

একদা পিকাসো অঙ্কিত শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক পারাবত দেশে দেশে প্রগতীশীল মানুষের পতাকায় শোভমান। সেই পারাবত এবং গাগারিনের মুখচ্ছবি বিশেষ তাৎপর্যে যুক্ত হোয়ে পুনশ্চ রূপ পেলো শিল্পীর হাতে।

দিল্লীর সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার প্রসঙ্গে।

এ-প্রসঙ্গে চর্বিত-চর্বণ কোরতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক আমরা। এ-স্থলে রঞ্জন-এর সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'দ্বিতীয় মত'-এর বক্তব্যের মূল সুর লক্ষণীয়। উক্ত রচনা থেকে কিয়দংশ নিচে তুলে দেওয়া গেল কেননা সত্যভাষণের সংসাহস আজকের দিনে নিতান্তই দুর্লভ। রঞ্জন-এর লেখনী উত্তরোত্তর ক্ষুরধার হোয়ে উঠে আমাদের সূচির আত্ম-মুগ্ধতার অবসান ঘটাতে সাহায্য করুক—এই কামনাই করি।

'আমার কথা এই যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকাদমী পুরস্কার লাভে বাঙালী যদি একদা কৃতার্থ বোধ করে থাকে, তাহলে বর্তমান বৎসরের অবহেলিত অজয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আজ আর নেই। আকাদমীর বা তন্নিয়োজিত বিচারকদের সাহিত্যবুদ্ধি বা নিরপেক্ষতা একদিন যদি মেনে নিয়ে থাকি পুরস্কারের মূঢ় মোহে, আজ তাদের বিরূপ বিচার বাঙালীকে মাথা পেতে নিতে হবে। বিশেষ করে এই জন্যে যে, আর বছরে এমনি দিনে দিল্লী যখন উদার হস্তে কোন ভাগ্যবান বাঙালী লেখককে আকাদমী পুরস্কারের পাঁচহাজারী শিরোপা দেবেন, তখন তিনিই শুধু সলোল জিহ্বা প্রসারিত করে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করবেন না, সারা বাঙলাই নিজেকে অনুগৃহীত জ্ঞান করবে। কই, এত প্রতিবাদের মধ্যে একবারও তো এমন কথা শোনা যায় নি যে, এর পর থেকে কোনো বাঙালী লেখক আর আকাদমী পুরস্কার গ্রহণ করবেন না?'

ভারতীয় সাংবাদিক সম্মানিত।

কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার রিপোর্টার শ্রীপ্রশান্ত সরকার কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের আনুকূল্যে যুক্তরাজ্যে শিক্ষালাভের জন্য একটি ফেলোসিপ লাভ কোরেছেন। ফেলোসিপ প্রাপ্ত সাংবাদিকরা ৭ই মে থেকে ছয় মাসের জন্য যুক্তরাজ্যে অবস্থান কোরছেন। এঁরা সাংবাদিকতার বৃটিশ পদ্ধতি ও বৃটিশ জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষালাভ কোরবেন।

একটি সুখ-সংবাদ।

বিশশতকে কতো অসম্ভবই না সম্ভব হোতে চললো! তাই বোধকরি বিস্মিত হবার বিস্ময়কর ক্ষমতা আজ নিতান্ত দুর্লভ।

আমরা কিন্তু প্রথমটা মুদ্রিত চিঠ্ঠিটি দেখে এইচ, জি, ওয়েলস্-এর উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে-আসা স্পেসম্যানের চিত্র মনে কোরেই চমকেছিলাম।

চমক ভাঙলো। না। ছবিটির বিষয় আসলে 'একটি বর ও বধূ'।

শিল্পী রথীন মিত্র আজ বাংলাদেশের সমীপকালীন শিল্প-জগতে স্বকীয় প্রতিভা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সম্প্রতি তিনি দিল্লীর বিখ্যাত পরিবারের স্বনামধন্য শিল্পী বরদা উকীলের কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ

হোয়েছেন।

শুভ-পরিণয় উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ-লিপির চিঠ্ঠিটি অভিনব মনে হওয়ায় 'সুন্দরম্'-এর পৃষ্ঠায় পুনরায় প্রকাশ করা গেল।

শিল্পীর সংসার-যাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক্—'সুন্দরম্'-এর এই শুভেচ্ছা বর্ষিত হয় যেন তাঁদের ললাটে।

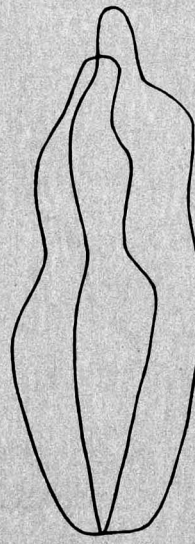

বিবাহের আমন্ত্রণ-লিপির উপরকার ছবি।

চিত্র-শিল্পীর সাহচর্যে সংবাদ-শিল্পীর কি সাফল্য?

অমিতাভ চৌধুরী তথা 'শ্রী নিরপেক্ষ'-র ম্যাগসেসাই পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য 'সুন্দরম্'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

'যুগান্তরে' বিভিন্ন সময় প্রকাশিত 'নেপথ্য দর্শনে'র ক্ষুরধার লেখনীর তাড়নায় অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন আত্মশুদ্ধির পথ।

লেখনী যে তলোয়ার অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয় তা আরো একবার প্রমাণিত হোল নাকি?

অমিতাভবাবুর এই সম্মানপ্রাপ্তি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসাবে তো বটেই উপরন্তু এই সম্মান যথার্থ সাংবাদিকের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন কোরে দেওয়ারই একটি ইঙ্গিত।

চিত্র-শিল্পীর সাহচর্যেই কি সংবাদ-শিল্পীর এই সাফল্যের সূত্র?

আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র উৎসব।

কোলকাতার ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে কিছুদিন আগে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র উৎসব হোয়ে গেল। মিস মারী সিটন উদ্বোধন সন্ধ্যায় আইজেনস্টাইনের ছবি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ব্যাটলসিপ পটেমকিন, জেনারেল লাইন, আইভান দি টেরিবল প্রভৃতি চিত্র দেখানো হয়।

চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইনের অবদান কতখানি তা আমরা পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমেই জানতে অভ্যস্ত। তাঁর ছবির সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় থাকা দরকার। কেননা স্রষ্টার সৃষ্টির সম্মুখীন হোলেই বোঝা যায় তাঁর আপন স্বরূপ।

এরূপ চলচ্চিত্র উৎসব বিশেষ উৎসাহ সম্ভারে সমর্থ—এজন্য উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ।

শিল্প-সত্য।

একটি প্রদর্শনী। বেশীর ভাগই 'নগ্ন' চিত্র। দর্শকরা বিমূঢ়, কৌতূহলী। ছবিগুলির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াবার ইচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও যেন উপায় নেই। নৈতিক অপরাধবোধ। দুএকজন শিল্প-রসিক অভিনন্দিত কোরেছিলেন সৃষ্টিগুলিকে। আর রাষ্ট্রের কর্ণধাররা? ছবিগুলি কেন নষ্ট করা হবে না—এই মর্মে সমন দেওয়ার কথা চোললো। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ে চিত্র শিল্পীদ্বয়ের নাম : লরেন্স ও ব্লেক। লরেন্স—সেই বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক তাঁর এই কাণ্ড! ব্লেক?—তিনি তো গত হোয়েছেন অনেক দিন। তাহলে—মাথা চুলকোন তাঁরা। না, ছবিগুলি নষ্ট কোরতে হবে না।

'লেডী চ্যাটার্লি'র বিচার-প্রসঙ্গে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। জীবৎকালে 'রেণ-বো' উপন্যাসেরও বিচার দেখে হেসেছিলেন লরেন্স। বিচারপতির রায় বেরিয়েছে : বই ছাপা হবে। তবে কেটে-ছেঁটে নয়। সৃষ্টির সমগ্রতাই বড়ো কথা। শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য কি? মহত্তর জীবন-সত্যের উন্মোচন। দেহ পবিত্র। আত্মার মতই পবিত্র। দেহ থেকে যে আনন্দের জন্ম তা অসুন্দর নয়, অপবিত্র নয়।

বহুবছর আগেকার প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—'এমন লেখা আছে যা নীতিপূর্ণ অথচ ঘোর অশ্লীল, অপরপক্ষে এমন লেখাও আছে যা শ্লীল অথচ যার নীতি ঘোর ভয়াবহ।'

লরেন্স-এর 'লেডি চ্যাটার্লি'র বিচার এই বিংশ শতকে আরো একবার প্রহসনের খোরাক জোগালো।

'রবীন্দ্রনাথ বৃত্তি'।

জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের উচ্চতর ও বিশেষ শিক্ষাপর্ষদ সিদ্ধান্ত কোরেছেন যে পাঁচ বছরের জন্য তিনজন ভারতীয়কে 'রবীন্দ্রনাথ বৃত্তি' দেওয়া হবে। বৃত্তিধারীরা জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জার্মাণ ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্য বা ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। শতবার্ষিক জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

'মেঘনাদবধ'-এর শতবর্ষ পূর্তি।

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে য়ুরোপীয় প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত কোরেছেন সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তার পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া আর সব কিছুই ছিল ক্ষীয়মাণ নিস্তেজ সাহিত্যের প্রতীক ও প্রতিভূ।

মাইকেল মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য। কল্পনা কোরতে পারি সেদিনকার পাঠকচিত্তের অভূতপূর্ব উত্তেজনা মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশের পর। পুরোনো চিন্তা, পুরনো আঙ্গিক ধূলিসাৎ কোরে যেন এগিয়ে এলো নবীন যৌবন। বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকলো সেই প্রথম। মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশের পর শতবর্ষ গত হোল। ১৮৬১ সালের জানুয়ারী মাসে এই কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আমরা কি এই শতবার্ষিকীর যথোচিত মর্যাদা দানে সক্ষম?—এই প্রশ্ন 'সুন্দরম্' পাঠক গোষ্ঠীর সামনে।

প্রাগ থেকে পুস্তক উপহার।

প্রাগের ক্যারোলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাতখানা মূল্যবান গ্রন্থ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহার দেওয়া হোয়েছিল। এই সাদর-উপহার আসলে ভারতীয়দের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতি-সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা যায়। গ্রন্থ কয়খানি চেক ভাষায় লেখা।

একটি অপরূপ শিল্পকর্ম।

কর্ণসুবর্ণ। এখন যার নাম রাঙা মাটি। রাজা শশাঙ্কের একদা শাসন কেন্দ্র ছিল রাঙা মাটি। সমগ্র গৌড়বাসীর অতিপ্রিয় নগরী। সুদূর প্রাচোর পথে সমুদ্র পাড়ী দিয়েছে নির্ভিক নাবিকের দল—সে তো এখান থেকেই।

এখানেই পাওয়া গিয়েছে চুন দিয়ে তৈরী এক দেবময় মুখমণ্ডল। গুপ্ত যুগের বোলেই অনেকের সুদৃঢ় বিশ্বাস। লাবণ্যময় মুখমণ্ডলটির নিম্নপত্রাকৃতি অর্ধনিমীলিত চোখ, স্ফুরিত অধরোষ্ঠ, ভূষণময় কর্ণ—গুপ্ত যুগের শিল্পশৈলী আর বাংলা দেশের কোমলতার ছাপ একই সঙ্গে লক্ষণীয়। অজন্তা গুহাচিত্রের বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডলের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ।

একটি বাংলা সাপ্তাহিক।

আরো একটি বাংলা সাপ্তাহিক-এর জন্ম হোল। 'অমৃত'। যে কয়টি সাপ্তাহিক রোয়েছে বাংলায় তা যথেষ্ট বলা যায় না, কেননা লেখক ও পাঠক দুই-ই পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নূতন একটি সাপ্তাহিকের আবির্ভাবকে আমরা সাদর-অভিনন্দন জানাই। কিন্তু উক্ত 'অমৃত' নামক পত্রিকার কভার থেকে শেষের পৃষ্ঠাটিতে পর্যন্ত বহুল-প্রচারিত 'দেশ' পত্রিকার অনুকরণ প্রচেষ্টার ছাপ বর্তমান থাকায় আমাদের এবং অনেকেরই হতাশার কারণ হোয়েছে।

আশা করি 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তথা কর্তৃপক্ষ এই ধারণা দূর কোরে একটি নূতন ধরণের সাপ্তাহিক উপহার দেবেন বাংলা দেশের পাঠকগোষ্ঠীকে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

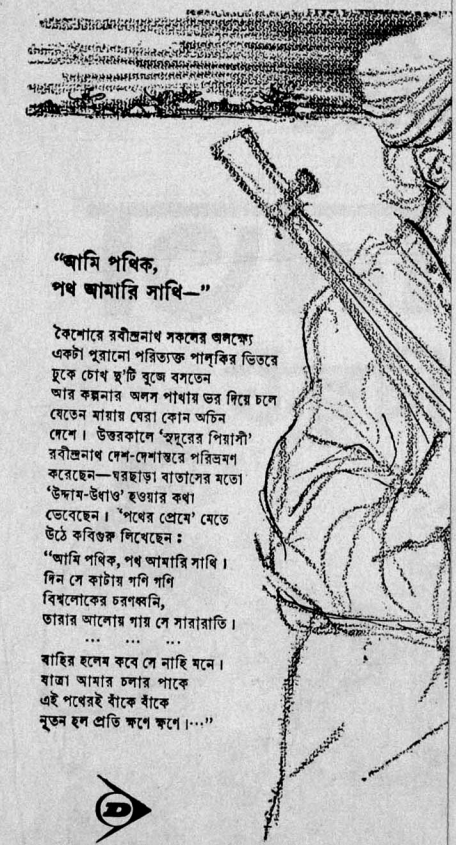

ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত

('বিশ্বভারতী'র সৌজন্যে) 'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম

বাক্-সাহিত্যের
বই

রবীন্দ্রায়ণ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন
সম্পাদিত
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতিখণ্ড দশ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড
প্রকাশিত হ'ল

●

অন্যান্য বই

বিনয় ঘোষের
বিদ্রোহী ডিরোজিও
৫·০০

নীলকণ্ঠের
ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে
৩·০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আরও আলো
৫·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
কন্যা-কলঙ্ক-কথা
৩·০০

জন হাওয়ার্ড
গ্রিফিন-এর
আলো থেকে অন্ধকারে
অনুবাদ
নিখিল সরকার
২·৫০

শংকর-এর
এক দুই তিন
৩·৫০

জরাসন্ধ-এর
পাড়ি ৩·০০

●

স্ত্রী ৪·০০
বিমল মিত্র

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

'লেডী চ্যাটার্লি'র বিচার-প্রসঙ্গে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। জীবৎকালে 'রেন-বো' উপন্যাসেরও বিচার দেখে গেছেন লরেন্স। বিচারপতির রায় বেরিয়েছে : বই ছাপা হবে। তবে কেটে-ছেঁটে নয়। সৃষ্টির সমগ্রতাই বড়ো কথা। শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য কি? মহত্তর জীবন-সত্যের উন্মোচন। দেহ পবিত্র। আত্মার মতই পবিত্র। দেহ থেকে যে আনন্দের জন্ম তা অসুন্দর নয়, অপবিত্র নয়।

বহুবছর আগেকার প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—'এমন লেখা আছে যা নীতিপূর্ণ অথচ ঘোর অশ্লীল, অপরপক্ষে এমন লেখাও আছে যা শ্লীল অথচ যার নীতি ঘোর ভয়াবহ।'

লরেন্স-এর 'লেডি চ্যাটার্লি'র বিচার এই বিংশ শতকে আরো একবার প্রহসনের খোরাক জোগালো।

'রবীন্দ্রনাথ বৃত্তি'।

জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের উচ্চতর ও বিশেষ শিক্ষাপর্ষদ সিদ্ধান্ত কোরেছেন যে পাঁচ বছরের জন্য তিনজন ভারতীয়কে 'রবীন্দ্রনাথ বৃত্তি' দেওয়া হবে। বৃত্তিধারীরা জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জার্মাণ ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্য বা ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। শতবার্ষিক জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

'মেঘনাদবধ'-এর শতবর্ষ পূর্তি।

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে য়ুরোপীয় প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত কোরেছেন সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তার পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া আর সব কিছুই ছিল ক্ষীয়মাণ নিস্তেজ সাহিত্যের প্রতীক ও প্রতিভূ।

মাইকেল মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য। কল্পনা কোরতে পারি সেদিনকার পাঠকচিত্তের অভূতপূর্ব উত্তেজনা মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশের পর। পুরোনো চিন্তা, পুরনো আঙ্গিক ধূলিসাৎ কোরে যেন এগিয়ে এলো নবীন যৌবন। বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকলো সেই প্রথম। মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশের পর শতবর্ষ গত হোল। ১৮৬১ সালের জানুয়ারী মাসে এই কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আমরা কি এই শতবার্ষিকীর যথোচিত মর্যাদা দানে সক্ষম?—এই প্রশ্ন 'সুন্দরম্' পাঠক গোষ্ঠীর সামনে।

প্রাগ থেকে পুস্তক উপহার।

প্রাগের ক্যারোলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাতখানা মূল্যবান গ্রন্থ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহার দেওয়া হোয়েছিল। এই সাদর-উপহার আসলে ভারতীয়দের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতি-সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা যায়। গ্রন্থ কয়খানি চেক ভাষায় লেখা।

একটি অপরূপ শিল্পকর্ম।

কর্ণসুবর্ণ। এখন যার নাম রাঙা মাটি। রাজা শশাঙ্কের একদা শাসন কেন্দ্র ছিল রাঙা মাটি। সমগ্র গৌড়বাসীর অতিপ্রিয় নগরী। সুদূর প্রাচ্যের পথে সমুদ্র পাড়ী দিয়েছে নির্ভিক নাবিকের দল—সে তো এখান থেকেই।

এখানেই পাওয়া গিয়েছে চুন দিয়ে তৈরী এক দেবময় মুখমণ্ডল। গুপ্ত যুগের বোলেই অনেকের সুদৃঢ় বিশ্বাস। লাবণ্যময় মুখমণ্ডলটির নিম্বপত্রাকৃতি অর্ধনিমীলিত চোখ, স্ফুরিত অধরোষ্ঠ, ভূষণময় কর্ণ—গুপ্ত যুগের শিল্পশৈলী আর বাংলা দেশের কোমলতার ছাপ একই সঙ্গে লক্ষণীয়। অজন্তা গুহাচিত্রের বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডলের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ।

একটি বাংলা সাপ্তাহিক।

আরো একটি বাংলা সাপ্তাহিক-এর জন্ম হোল। 'অমৃত'। যে কয়টি সাপ্তাহিক রোয়েছে বাংলায় তা যথেষ্ট বলা যায় না, কেননা লেখক ও পাঠক দুই-ই পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নূতন একটি সাপ্তাহিকের আবির্ভাবকে আমরা সাদর-অভিনন্দন জানাই। কিন্তু উক্ত 'অমৃত' নামক পত্রিকার কভার থেকে শেষের পৃষ্ঠাটিতে পর্যন্ত বহুল-প্রচারিত 'দেশ' পত্রিকার অনুকরণ প্রচেষ্টার ছাপ বর্তমান থাকায় আমাদের এবং অনেকেরই হতাশার কারণ হোয়েছে।

আশা করি 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তথা কর্তৃপক্ষ এই ধারণা দূর কোরে একটি নূতন ধরণের সাপ্তাহিক উপহার দেবেন বাংলা দেশের পাঠকগোষ্ঠীকে।

—**নিজস্ব সংবাদদাতা**

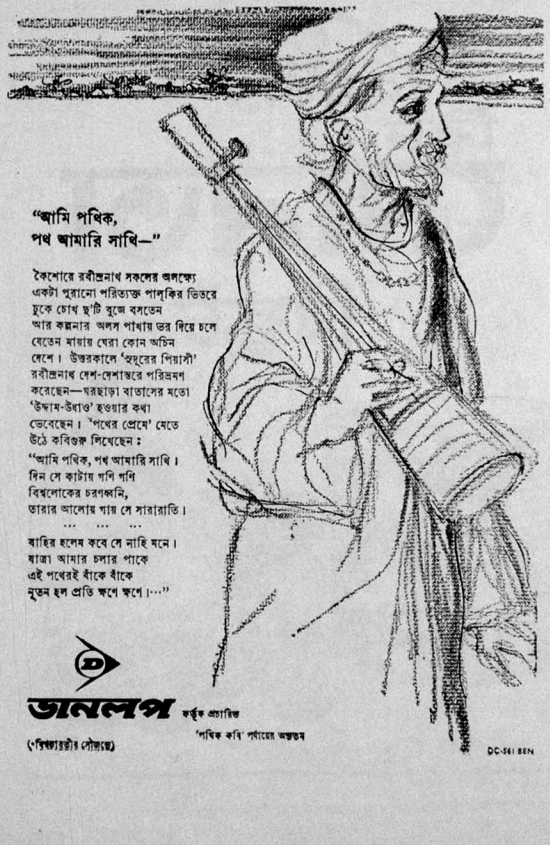

'নীলরক্ত লাল হয়ে গেছে'

এবং

'অলাত চক্র-'র পর

সুভো ঠাকুরের

সর্বাধুনিক পুস্তক

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা

বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

যা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক

'সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা'-র

চরিত্র-চিত্রণের

বিচিত্র মিছিলে

যোগদান কোরেছে

অসংখ্য নরনারী

বিখ্যাত শিল্পী থেকে

অখ্যাত শিল্পপতি,

নগণ্য ভিখারিণী থেকে লক্ষপতি

সবাই একাকার

সুভো ঠাকুরের নজরে

দাম : সাড়ে চারটাকা

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

বাক্-সাহিত্যের
বই
রবীন্দ্রায়ণ
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
সম্পাদিত
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতিখণ্ড দশ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড
প্রকাশিত হ'ল

●

অন্যান্য বই
বিনয় ঘোষের
বিদ্রোহী ডিরোজিও
৫·০০
নীলকণ্ঠের
ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে
৩·০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আরও আলো
৫·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
কন্যা-কলঙ্ক-কথা
৩·০০
জন হাওয়ার্ড
গ্রিফিন-এর
আলো থেকে অন্ধকারে
অনুবাদ
নিখিল সরকার
২·৫০
শংকর-এর
এক দুই তিন
৩·৫০
জরাসন্ধ-এর
পাড়ি ৩·০০
•
স্ত্রী ৪·০০
বিমল মিত্র

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

লিলির
রিচ
নোনতা
বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সুন্দরম্ সঙ্কলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর, কর্তৃক ৬।এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭ নং, গ্রান্ট লেন কর্তৃক মুদ্রিত।